প্রথম বাংলা সংস্করণ : মে, ১৯৬০

প্রকাশক :
চন্দনা ঘোষ
১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৯
(আমহার্স্ট স্ট্রীট, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিপরীতে)

মুদ্রক :
এ চ্যাটার্জী
প্রিণ্টোক্রাফট
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত জীবনী

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, তিনি (লু শুন) শুধু যে একজন মহান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাই নয় তিনি একজন মহান চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী ছিলেন। লু শুন একজন দৃঢ় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, সকল হীন স্তাবকতা বা আজ্ঞানুবর্তীতা থেকে মুক্ত; ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক জনগণের মধ্যে এই গুণ মূল্যাতীত। জাতির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রতিনিধিত্ব ক'রে, লু শুন শত্রুর নগরদুর্গকে বিদীর্ণ ও ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত ক'রেছিলেন; সাংস্কৃতিক রণক্ষেত্রে তিনি সাহসীতম ও সবচেয়ে সঠিক, দৃঢ়তম, সবচেয়ে অনুগত এবং সবচেয়ে প্রদীপ্ত জাতীয় বীর, আমাদের ইতিহাসে এই বীরের কোন তুলনা নেই। তিনি যে পথ নিয়েছিলেন সেই পথই চীনের নতুন জাতীয় সংস্কৃতির পথ।

মাও সে-তুঙ

লু শুন—মহান বিপ্লবী, চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিক—

সত্যের সন্ধানে—

১৮৮১ সালে চেকিয়াং প্রদেশের শাওশিং এ লু শুন জন্মগ্রহণ করেন। এমন একটা সময় তাঁর জন্ম হয় যখন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে ও চিং রাজবংশের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

চিং রাজসভার অক্ষমতা এবং দুর্নীতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের অনধিকার প্রবেশ এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে বার বার দেশে সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হ'য়ে গ্লানির কারন হয়েছিল। আর জনগণ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন। দেশের এই রকম শোচনীয় অবস্থা দেখে লু শুন সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ব্যবসাদার বা সরকারী কেরানী হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাঁর ছিলনা, তাই ১৮৯৮ সালে জন্মস্থান শাওশিং ত্যাগ করে তিনি নানকিং এ স্কুলে ভর্ত্তি হন।

"চীনের জন্য উৎসর্গ করলাম আমার শেষ রক্তবিন্দু"—

১৯০২ সালে লু শুন জাপানে পড়তে যান। সেখানে তিনি অত্যাচারী চিং সরকারের অবসান ঘটাতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর চিন্তাধারা একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণতি লাভ করে। তাঁর "স্ব-প্রতিকৃতি" কবিতা থেকে নেয়া উপরের পংক্তিটিতে তাঁর দেশের মুক্তিব জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা মূর্ত হয়েছে।

নতুন পথে সাহিত্য-সাধনার জন্য মেডিক্যাল স্কুল ত্যাগ—

লু শুন জাপানের সেন্দাই এ মেডিকাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁর ধারণা ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান চীনের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তখন রাশিয়া—জাপানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও দেশ বিভাজনে তৎপর হ'য়ে উঠেছে।

ক্লাসে একদিন ম্যাজিক লণ্ঠনে একটি দৃশ্য দেখে লু শুন অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রনা অনুভব করেন। দৃশ্যটি ছিল একদল নির্বিকার চীনা দর্শকের সামনে জাপানী সৈন্যরা একজন চীনার শিরঃচ্ছেদ করছে। তিনি বুঝলেন যে অত্যন্ত সবল ও সুস্থ জনগণও যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হয়, তবে তাদের "এইরকম দৃষ্টান্তে পরিণত করা যায় বা এইসব দৃশ্যের নির্বিকার দর্শকে পরিণত করা যায়।" লু শুন স্থির করলেন তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়ে নতুন পথে সাহিত্য সাধনা শুরু করবেন যাতে, "জনগণের চরিত্র পাল্টানো যায় আর সমাজ সংস্কার করা সম্ভব হয়"।

পথে পথে প্রচার—

লু শুনের চীনে প্রত্যাবর্তনের তৃতীয় বৎসরে ১৯১১ সালের বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি তখন শাওশিং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক। এই বিপ্লবকে মনেপ্রাণে স্বাগত জানিয়ে তিনি ছাত্রদের প্রচার সংঘে সংগঠিত করেন এবং পথে পথে প্রচার কার্য্য চালাতে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন বুর্জোয়া কায়দায় এই বিপ্লব একজন সম্রাটকেই শুধু গদীচ্যুত করেছে কিন্তু "কার্য্যতঃ সবই আগের মত রয়ে গিয়েছে" তখন অচিরেই তাঁর মোহ ভঙ্গ হ'ল।

নতুন যুগের ভোরে—

"অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়-ধ্বনি আমাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এনে দিয়েছে।" ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লু শুন এই জয়কে "নুতন যুগের সূচনা" বলে অভিহিত করেন। এর দুই বছর পরে চীনে সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়েই চীনের বিপ্লব সর্বহারাদের নেতৃত্বে নয়া গণতান্ত্রিক স্তরে প্রবেশ করে। চীনা বিপ্লব কোন পথে সাফল্য লাভ করতে পারে—বহুদিন ধরে মনে মনে আলোচিত এই প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিত লু শুন এই সময় পান। তাঁর এই নতুন চিন্তাধারা নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লু শুন লড়াই শুরু করেন এবং প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যান।

সর্বহারার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি আনুগত্য—

১৯২১ সালে চীনা সর্বহারারা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। পরের বছর দেশের "উজ্জ্বলতার জন্য যুদ্ধরত" লু শুন ঘোষণা করলেন বিপ্লবকে উৎসাহদানের জন্য সাহিত্যকে "সৈন্যাধ্যক্ষর আদেশ মেনে চলতেই হবে"। পরে লু শুন অকুণ্ঠভাবে বলেন যে তাঁর সাহিত্য "আদেশমাফিক লেখা"। সচেতনভাবে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রনীবাহিনীর নির্দেশ মেনে নিয়ে লু শুন নিঃস্বার্থ ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সর্বহারাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্রদের ন্যায়-সংগ্রামে দৃঢ় সমর্থন—

১৯২৫ সালে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে পিকিং এর মহিলা নরম্যাল কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলনের মাধ্যমে কলেজের প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেন্টকে বহিস্কৃত করে। লু শুন বিপ্লবী ছাত্রদের দৃঢ় সমর্থন করেন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উত্তরের যুদ্ধবাজ সরকার এবং তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় লু শুন কখনই বিপ্লবী উদ্দীপনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পশ্চাদপদ হন নি। "কুকুর-কে জলের মধ্যেই মারো" এর প্রয়োজনীয়তার উপর লু শুন গুরুত্ব দিতেন—না হলে তারা সাঁতরে পারে এসে আবার কামড়াবে। লু শুনের "ন্যায় ব্যবহার স্থগিত রাখা" নামে যে প্রবন্ধ থেকে উপরের উক্তিটি নেওয়া হয়েছে তা আসলে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক। এই প্রবন্ধে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্যে থেকে যে শিক্ষা লাভ হয়েছে তা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রেছেন।

ক্যান্টনের সান্-ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জরুরী সভা—

১৯২৭ সালের এপ্রিলে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্ররোচিত কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রকাশ্যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বহু চীনা কমিউনিষ্ট ও বিপ্লবী জনগণকে হত্যা করে। সান্-ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রগতিশীল ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। কর্মচারী সমিতির একটি জরুরী সভায় লু শুন এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানান এবং ছাত্রদের

মুক্তি দাবী করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই দাবী না মানায় লু শুন ঘৃণাভরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন।

মার্কসবাদের উৎসাহী ছাত্র—

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে লু শুন সাংহাই যান। সাংহাইয়ে তাঁর চিন্তাধারা এক নতুন স্তরে পৌছয়। শ্রেণী সংগ্রামের নির্মম বাস্তবতা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। এইবার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কথা মনে রেখে তিনি কঠিন সংগ্রামের মধ্যে এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, গভীর আগ্রহ সহকারে মার্কসীয় তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। তাঁর পুরানো "বিবর্তনবাদের এক পেশে বিশ্বাস"কে অতিক্রম করে লু শুন কঠোরভাবে "আত্মবিশ্লেষণ করতেন।" তিনি বলতেন "যে সমস্যাগুলি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেগুলি মুহূর্তেই সহজ হয়ে যায়"। যে সময় থেকে তিনি মার্কসীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্ণদীক্ষিত হলেন তখন থেকেই তিনি একজন মহান কমিউনিষ্ট।

বামপন্থী লেখক লীগ গঠনের সভায় বক্তৃতা—

গোড়া পত্তনের প্রথম দিন থেকেই বামপন্থী লেখক লীগকে দুইমুখী সংগ্রামে সামিল হ'তে হয়। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ লেখক লীগ গঠনের সভায় লু শুন "বামপন্থী লেখক লীগ সম্বন্ধীয় চিন্তা" এই মর্মে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে লু শুন সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বলেন যে বামপন্থী লেখক গোষ্ঠী যদি শ্রমিক, কৃষক এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে শুধুমাত্র "মৌলিক ভাবধারার" বন্যা বইয়ে দেন তবে অতি সহজেই তারা "দক্ষিণপন্থী লেখক গোষ্ঠীতে" পরিণত হয়ে যেতে পারেন। তাঁর এই ভাষণে তিনি চৌ ইয়াং ও তার গোষ্ঠীর ওয়াং মিং "বামপন্থী" সুবিধাবাদী পক্ষের মতবাদকে কঠোর ভাবে খণ্ডন করেন।

চেয়ারম্যান মাও ও কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিনন্দন—

১৯৩৫ সালে বিজয়ী লাল ফৌজ যখন "লং মার্চ" এর শেষে উত্তর শেনসি প্রদেশে পদার্পণ করে তখন লু শুন অত্যন্ত উল্লসিত হন। তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভাল

যাচ্ছিল না। তিনি সর্বহারা শ্রেণীর উষ্ণতম আবেগ সমন্বিত একটি বার্তা চেয়ারম্যান মাও এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। এই বার্তায় তিনি বলেন, "চীন এবং সমগ্র মানব জাতির আশা আকাংখা আপনাদের উপর নির্ভর করছে"।

চৌ ইয়াং এবং তাঁর গোষ্ঠীকে নিন্দা—

ওয়াং মিং এর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরের বছর চৌ ইয়াং এবং তার গোষ্ঠী "জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য সাহিত্য" নামে একটি বুর্জোয়া শ্লোগান চালু করে। সর্বহারাদের জন্য একটি শ্লোগানের মাধ্যমে লু শুন এর তীব্র উত্তর দেন "জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধের জনপ্রিয় সাহিত্য"। তীক্ষ্ণ মার্কসীয় রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে লু শুন বুঝেছিলেন যে চৌ ইয়াং এবং তার গোষ্ঠী "সৎ" নয়। স্রোতের বিরুদ্ধে যাবার মতো নির্ভীক বৈপ্লবিক তেজস্বীতা নিয়ে লু শুন বিপ্লবীদের ভিতর আত্মগোপনকারী মেকি মার্কসবাদী, প্রতিবিপ্লবী এবং সুবিধাবাদীদের মুখোস খুলে দেন।

যুবসম্প্রদায়ের জন্য উদ্বেগ—

লু শুন মনে করতেন যুবসম্প্রদায়ই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ। তিনি একবার বলেছিলেন "আজকের দেশের যুবসম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি তৃতীয় যুগের (সমাজতান্ত্রিক সমাজ—সম্পাদক) প্রতিষ্ঠা করা যা এখনও পর্যন্ত চীনের ইতিহাসে অজ্ঞাত"। পরে তিনি পরিস্কারভাবে বলেন, "বিপ্লবের জন্য আমাদের বিপ্লবীর প্রয়োজন" এবং "আমাদের একদল নতুন সংগ্রামী তৈরী করতে হবে"। তিনি যুবকদের তাদের সমাজের এবং দেশের বাস্তব সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকার এবং কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলার উপর জোর দিতেন। সর্বদা সংগ্রাম চালিয়ে যাও, কখনও নতি স্বীকার করোনা—এই ছিল তাঁর কথা। বিপ্লবী যুবসম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে তুলতে লু শুন প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন এবং নিজের জীবনের বিনিময়েও যুবসম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক বা বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন কিছু করা থেকে তিনি বিরত হননি।

বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি জীবন—

চীনের জনগণের মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে সারাজীবন বীরের মত সংগ্রাম ক'রে ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে কমিউনিষ্ট লু স্যুনের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লেখা "ট্রট্স্কিপন্থীদের চিঠির উত্তর" এ তিনি জাতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ট্রট্স্কিপন্থীদের নিন্দা করেন এবং সেই সঙ্গে চেয়ারম্যান মাও এর বিপ্লবীকর্মধারার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানান ও চেয়ারম্যান মাও এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সর্বহারা এবং জনগণের আজীবন সেবার জন্য তাঁর সার্বিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং দৃঢ় সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী চেয়ারম্যান মাও এর বিপ্লবী কর্মধারাকে অনুসরণ করতে এবং সর্বহারাদের একনায়কত্বের অধীনে বিপ্লবকে শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে নিতে চীনের জনগণকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ করবে।

অনুবাদ: পার্থ সেন

লু স্যুনের সাহিত্য কর্ম:

তিনি তিনটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন: 'যুদ্ধের ডাক', 'বিচরণ', এবং 'পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি'। তাঁর ষোল খণ্ডের প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'গরম হাওয়া' ও 'কবর'। অনুবাদের মধ্যে আছে: ফেদেইয়েভের 'উনিশ', গোগোলের 'মৃত আত্মারা', গোর্কির 'রুশদেশের রূপকথা,' সিবাকিমোভিচের 'আয়রণ স্ট্রিম,' শোলোকভের 'ধীরে বহে ডন', প্রভৃতি। এ ছাড়া বিভিন্ন মার্কসীয় দর্শন ও প্লেখানভের শিল্পতত্ত্ব, লুনাচারস্কীর শিল্প-সাহিত্য-তত্ত্ব ও সমালোচনা প্রভৃতির অনুবাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা অনুবাদকের দু একটি কথা :

এই ছোট্ট কাব্যগ্রন্থটি অনুবাদ ক'রতে গিয়েই বুঝলাম, এটি কি বিশাল ! এর প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে আছে রূপকধর্মীতা, তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষ। যেহেতু চীন দেশের সামাজিক রীতিনীতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ভারতবর্ষ থেকে অনেকখানি ভিন্ন এবং লু শুনের সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাই তাঁর লেখা আমাদের কাছে অনেক সময় দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট লাগতে পারে। কিন্তু প্রতিটি লেখা একাধিকবার পড়লে এবং যাকে বলে প্রতিটি শব্দ ধরে পড়লে, এর মর্মকথা উপলব্ধি করা যায় এবং তখনই এক নতুন আনন্দ ও বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা আসে। লু শুন শানিত শলাকা, জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। লু শুন ভারতবর্ষের অপসংস্কৃতির বালির বাঁধ ভেঙে তছনছ করে দেবেন। লু শুন কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে ছড়িয়ে পড়ুন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার লেখক বন্ধুবর শ্রীদেবব্রত পালের কাছে—তিনি 'মাই লস্ট লাভ' কবিতাটি অনুবাদ করে এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন। আর যথাযথ পরামর্শ দেবার জন্য আমি শ্রীপার্থ সেন ও মনোজ রায়চৌধুরীর কাছেও কৃতজ্ঞ।

এই ছোট্ট কাব্যগ্রন্থটির ভাষান্তর করার দুঃসাহস আমি নিয়েছি ও যথাসাধ্য ইংরিজী মূলভাব ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি। এর সার্থকতা পাঠকের মতামতের উপরই নির্ভর ক'রছে।

“বুনো ঘাসের” ইংরিজি সংস্করণের জন্ত, ১৯৩১ সালে, লু শুনের লেখা ভূমিকা

মিঃ ওয়াই, এস, ফেং এক বন্ধুর মারফৎ তার “বুনো ঘাসের”* ইংরিজি অনুবাদটি আমার কাছে পাঠিয়ে আমাকে দু একটা কথা লেখার জন্য বলে পাঠিয়েছিলেন। ইংরিজি না জানার দরুন দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই দুএকটা কথা বলতে পারি। যা হোক আমি আশা করি অনুবাদক যা চেয়েছিলেন তার কেবল অর্ধেক কাজ করার জন্য কিছু মনে করবেন না।

এই কুড়িটারও কিছু বেশী সংখ্যক ছোট লেখাগুলো ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে পিকিংয়ে লেখা হয়েছিল। প্রত্যেক লেখার শেষে তারিখ দেওয়া আছে। এগুলো পরপর য়ু স্যু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হ’য়েছিল। এ লেখাগুলোর অধিকাংশই আসলে আকস্মিক চিন্তার প্রতিফলন। যেহেতু সেই সময় খোলাখুলিভাবে কথা বলা কঠিন ছিল. সেইহেতু আমাকে কখনও কখনও কিছু দ্ব্যর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হ’য়েে

কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। “আ
প্রেম সম্বন্ধে তখন যে ধরণের কবিত
লেখা; “প্রতিহিংসা” লেখা হয়েছিল স
বিতৃষ্ণা থেকে; “আশা” লেখা হয়েছিল যুবকদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে বিস্মিত হয়ে। যে সব পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোকেরা যুদ্ধবাজদের অসৎ কার্যে প্ররোচনা দিত, “এমনই এক যোদ্ধা” তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। আমার যে সব বন্ধুরা আমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য আমি

* বুনো ঘাসের অনুবাদক ছিলেন ফেং ইউ-শেং। এঁর ইংরিজি অনুবাদটি কখনও ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তিকালে এই মুখবন্ধটি লেখক “টু হার্টস্”এ প্রকাশ করেছিলেন। “টু হার্টস” ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে লেখা রচনাবলীর সংকলন।

"ক্ষয়ে যাওয়া পাতা" লিখেছিলাম। তুয়ান চি-জুই সরকার যখন নিরস্ত্র মিছিলের উপর গুলি চালায়, তার পরেই আমি লিখেছিলাম, "পাণ্ডুর রক্তচিহ্নের মাঝে"—এমনই সময়, যখন আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলাম। যুদ্ধবাজ ফেংতিয়েন ও চিহ্‌লি চক্রের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে লিখেছিলাম, "জাগরণ"। এরপর আমি পিকিংয়ে থাকতে অসমর্থ হই। সুতরাং আরও বলা যেতে পারে যে এগুলোর অধিকাংশই অবহেলিত নরক রাজ্যের সীমান্তে ফোটা ছোট ছোট ধূসর ফুল, যেগুলো সঙ্গত কারনেই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে নি। এই নরকরাজ্য শেষ হতে বাধ্য। কতিপয় বাগ্মী ও নির্দয় "বীর" এর অভিব্যক্তি ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে আমি এটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। তাঁরা তাদের উচ্চাশাকে সেই সময় অনুধাবন করতে পারেন নি। এর ওপর ভিত্তি করেই আমি লিখেছিলাম, "যে সুন্দর নরক শেষ হ'ল"।

পরবর্তিকালে এই ধরণের লেখা আমি আর লিখি নি। যে সময়ে ঘটনা প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরণের লেখা, এবং এমনকি এই ধরণের প্রতিফলনকেও টিঁকে থাকতে দেওয়া হত না। আমার মনে হয় এটা হয়ত একটা ভালো ব্যাপার। আর এখানেই আমার এই অনুবাদগুলোর মুখবন্ধ শেষ হচ্ছে।

নভেম্বর ৫, ১৯৩১

মুখবন্ধ

যখন আমি নীরব থাকি, আমি পরিপূর্ণ বোধ করি ; যখন আমি কথা বলতে উদ্যত হই, আমি অন্তঃসার শূন্যতার সম্পর্কে সচেতন।

অতীত জীবন মৃত। তার মৃত্যুতে আমি উল্লসিত, কারণ এ থেকে আমি জানতে পারি যে একদা এর অস্তিত্ব ছিল। মৃত জীবন ক্ষ'য়ে গেছে। এর ক্ষয়ে আমি উল্লসিত, কারণ এ থেকে আমি জানতে পারি, এ জীবন শূন্য তো নয়।

মাটিতে পরিত্যক্ত জীবনের ক্লেদে কোন উঁচু গাছ জন্মায় না, কেবল জন্মায় বুনো ঘাস। তার জন্য আমিই দোষী।

বুনো ঘাস গভীরে শেঁকড় ছড়ায় না। এর সুন্দর ফুল নেই, পাতা নেই, তবু সে শিশির পান করে, পান করে জল, আর পান করে মৃতের রক্ত মাংস, যদিও সকলে এর প্রাণহরণ করতে উদ্যত। যত দিন সে বেঁচে থাকে, মরে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সবাই একে পদদলিত করে ও ছেঁটে ফেলে।

আমি কিন্তু চিন্তিত নই ; আমি আনন্দিত। আমি উচ্চস্বরে হাসবো ও গান গাইব।

আমি আমার বুনো ঘাস ভালবাসি, কিন্তু যে মাটি বুনো ঘাসে নিজেকে ভূষিত করে আমি তাকে ঘৃণা করি।

মাটির তলায় একটা গোপন আগুন ছড়াচ্ছে, ফুঁসছে। যদি একবার পৃথিবীর স্তর ভেদ ক'রে গলিত লাভার উদ্‌গিরণ ঘটে, তা বুনো ঘাস ও উঁচু গাছ, সমস্তই গ্রাস করবে—ক্ষয় হবার আর কিছুই থাকবে না।

আমি কিন্তু চিন্তিত নই ; আমি আনন্দিত। আমি উচ্চস্বরে হাসবো ও গান গাইবো।

আকাশ ও পৃথিবী এত প্রশান্ত যে আমি উচ্চস্বরে হাসতে পারি না, গাইতে-ও পারি না। আর যদি এরা এত প্রশান্ত নাও হত, হয়ত তবুও আমি কিছুই করতে পারতাম না। আলো এবং আঁধার, জীবন ও মরণ, অতীত এবং

বর্তমানের মধ্যে আমি এই বুনো ঘাসের গোছা আমার অর্ঘের মতো উৎসর্গ. করছি আমার বন্ধু ও শত্রুকে, মানুষ ও পশুকে, যাদের আমি ভালবাসি এবং যাদের আমি ভালবাসি না তাদের।

আমার নিজের জন্য এবং আমার বন্ধু ও শত্রুর জন্য, মানুষ ও পশুর জন্য, যাদের আমি ভালবাসি এবং যাদের ভালবাসি না তাদের জন্য, আমি কামনা করি যেন এই বুনো ঘাসের দ্রুত মৃত্যু ও বিনাশ ঘটে। অন্যথায় এর অর্থ আমি বেঁচে নেই, এবং মৃত্যু ও বিনাশের চেয়েও তা সত্যিই আরও বেশী অনুশোচনার।

যাও তবে বুনো ঘাস, আমার মুখ বন্ধ নিয়ে তুমি যাও!

সাদা মেঘের প্রাসাদ, কোয়াং চউয়ে লেখা (লু শুন)

এপ্রিল ২৬, ১৯২৭

শরতের রাত্রি

আমার বাড়ির পেছনের জমির দেয়ালের পেছনে দুটো গাছ দেখতে পাবেন: এর একটা খেজুর গাছ, অপরটাও খেজুর গাছ।

তাদের উপরে রাতের আকাশ আশ্চর্য আর উঁচু। আমি কখনও এমন আশ্চর্য, উঁচু আকাশ দেখিনি। মনে হয় এ যেন মানুষের এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায়, যাতে মানুষ উপরে তাকিয়ে তাকে দেখতে না পায়। এই মুহূর্তে এর রং শুধুই নীল; এবং এর অসংখ্য নক্ষত্রের চোখ শান্তভাবে মিটমিট করছে। এর ঠোঁটে খেলে যায় মৃদু হাসি, এই হাসিকে সে গভীর অর্থবহ বলে ভাবছে মনে হয়; আর এ আমার উঠোনের বুনো গাছ গুলোকে ঘন কুয়াশায় ধূসরিত করেছে।

আমার কোন ধারণাই নেই এ গাছগুলোর নাম কি, সাধারণতঃ কি নামেই বা এরা পরিচিত। আমার মনে আছে, এদের একটা গাছে গোলাপী রংয়ের ছোট ছোট ফুল ফোটে, এবং এর ফুলগুলো এখনও ফুটছে, যদিও

সেগুলো আগের চেয়েও ছোট। শীতল রাত্রির বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে তারা স্বপ্ন দেখে বসন্তের আগমনের, শরতের আগমনের। তারা স্বপ্ন দেখছে সেই শীর্ণ কবির আগমনের যে তাদের শেষ পাপড়ির ওপর তার অশ্রু মোচন করবে আর তাদের বলবে, শরত আসবে, শীত আসবে, তবুও তারপরে বসন্ত আসবে, যখন প্রজাপতিরা এদিক ওদিক উড়ে বেড়াবে এবং মৌমাছিরা বসন্তের গীতি-গুঞ্জন শুরু করবে। যদিও সেই ছোট্ট গোলাপী ফুলগুলো ঠাণ্ডায় বিমর্ষ লাল হয়ে ওঠে ও কাঁপতে থাকে, তারা তখন হেসে ওঠে।

ওদিকে খেজুর গাছগুলোর একেবারে সব পাতা ঝরে গেছে আগে অন্য লোকেরা পেত না, দু'একটা ছেলে এসে খেজুর পেড়ে নিত। কিন্তু এখন একটা খেজুরও নেই, আর গাছদুটোও তাদের সব পাতা হারিয়েছে। ছোট্ট গোলাপী ফুলগুলো যে শরতের পর বসন্তের আগমনের স্বপ্ন দেখে, সেটা তারা জানে ; আর ঝরা পাতাগুলো যে বসন্তের পর শরতের আগমনের স্বপ্ন দেখে সেটাও তারা জানে। হয়ত তাদের সব পাতাই ঝরে গেছে আর শুধু শাখা আছে পড়ে ; কিন্তু এই শাখাগুলো আর ফল ও পাতার ভারে নুয়ে পড়ে না বরং প্রাচুর্যের সাথে নিজেদের বাড়িয়ে চলে। কয়েকটা শাখা, যদিও এখন পড় পড়, তারা নিজেদের বাকলের ক্ষতকে সারিয়ে তুলছে। লাঠি দিয়ে খেজুর পাড়ার সময় তাদের বাকলে এই ক্ষত তৈরী হয়েছিল ; ওদিকে লোহার মত শক্ত সবচেয়ে সোজা ও লম্বা শাখাগুলো ঐ আশ্চর্য্য উঁচু আকাশটাকে নিঃশব্দে ভেদ করে যাচ্ছে। আকাশটা শুধু মিট মিট করে তাকাচ্ছে। তারা পূর্ণ চাঁদটাকেও পাণ্ডুর ও অসহায় করে বিদীর্ণ করছে।

আতংকে করুণ চোখে তাকিয়ে আকাশটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর নীল হয়ে উঠছে, বেশী বেশী করে অস্থির হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন ঐ চাঁদটাকে পেছনে ফেলে, খেজুর গাছগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে সে মানুষের এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু চাঁদটাও নিজেকে পূবের আকাশে আড়াল করছে ; আর তখনও নীরব ও লোহার মত কঠিন, নিষ্পত্র শাখাগুলো ঐ আশ্চর্য উঁচু আকাশটাকে মরণশীল আঘাত হানার শপথ নিয়ে বিদীর্ণ করছে, কে জানে কতভাবে ঐ আকাশটা তার যাদুকরী চোখে মিট মিট করে তাকিয়েছে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে একটা ভয়ংকর নৈশ পাখি চলে যায়।

হঠাৎ আমি মধ্য রাতের অট্টহাসি শুনি। ঘুমন্ত লোকেরা যাতে জেগে না ওঠে তাই যেন শব্দটা চাপা। তবুও চারিদিকের বাতাসে এই হাসির প্রতিধ্বনি ফেরে। মধ্যরাত, তায় পাশে কেউ নেই। ঠিক তখনই উপলব্ধি করি, আমিই হাসছি এবং সেই হাসির তাড়নায় আমি তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে ফিরে আসি। এসেই আমার মোমের বাতিটার সল্‌তেটা উসকে দিই।

পেছনের জানলার কাচে একটা অস্থির মৃদু শব্দ শোনা যায়। সেখানে কাচের ওপর এক ঝাঁক পোকা বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিঃসন্দেহে জানলার কাগজের ছিদ্র দিয়ে এখন কয়েকটা পোকা ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। ভেতরে ঢুকেই তারা আবার ঐ বাতির চিমনির উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আরেকটা অস্থির মৃদু শব্দ তুলছে। একটা পোকা চিমনির ওপর দিয়ে ভেতরে ঢোকে, আগুনে পড়ে; কল্পনায় মনে হ'ল এই শিখাটা বাস্তব। কাগজের চিমনির উপর আরও দু তিনটে পোকা বিশ্রাম নিচ্ছে ও হাঁফাচ্ছে। গতরাতে একটা নতুন চিমনি লাগান হয়েছিল। এর তুষারের মত সাদা কাগজ ঢেউ খেলানো ভাঁজে ভাঁজ করা, আর এর এক কোনায় আঁকা রক্তলাল গন্ধরাজ ফুলের ডাল।

যখন রক্তলাল গন্ধরাজ ফুটবে, ঐ খেজুর গাছ দুটো উজ্জ্বল পাতার ভারে নুয়ে আবার ছোট ছোট গোলাপী ফুলগুলোর স্বপ্নে স্বপ্নিল হবে এবং আমি আবার সেই মধ্যরাতের উচ্চ হাসি শুনতে পাবো। আমি চাকতে সেই চিন্তার লাগাম ছিঁড়ে কাগজের উপর ছোট্ট সবুজ পোকাগুলোর দিকে তাকাই। সূর্যমুখী ফুলের বীজের মত তারা—তাদের মাথাগুলো বড় আর লেজ ছোট। তাদের আকার একটা গমের দানার অর্ধেক। তাদের সব কিছুই প্রিয়, করুণ সবুজ।

আমি হাই তুলি, সিগারেট ধরাই, এবং ধুয়ো ছাড়ি, আর বাতির সামনে এই সবুজ, শৌর্যবান বীরদের নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯২৪।

ছায়ার বিদায় গ্রহণ

সময়ের দিশা হাবিয়ে যদি কোন সময়ে ঘুমোও, তোমাব ছায়া এসে বিদায় চেয়ে নিয়ে হয়ত এ কথাগুলো বলবে :

"স্বর্গে এমন কিছু আছে যা আমি ঘৃণা করি, আমি সেখানে যেতে চাই না। নবকে এমন কিছু আছে, যা আমি ঘৃণা কবি, আমি সেখানে যেতে চাই না। তোমাব আগামী স্বর্ণ জগতে এমন কিছু আছে যা আমি ঘৃণা করি, আমি সেখানে যেতে চাই না।

"আবাব এই যে তুমি তোমাকেও আমি ঘৃণা কবি।

"বন্ধু, আব আমি তোমায় অনুসবণ কবব না, আমি এখানে থাকতে চাই না।

"না আমি চাই না!

"আঃ না! আমি চাই না। তাব চেয়ে আমি শূন্যে বিবাগী হব।

"আমি নিছকই একটা ছায়া। আমি তোমাকে ছেড়ে আঁধাবেই ডুব দেব। জানি আঁধাব আমাকে গ্রাস কববে, আব আলোও আমাকে নিঃশেষ ক রে দেবে।

"কিন্তু আমি আলো আব ছায়াব মধ্যে ঘুবতে চাই না, তাব চেয়ে আমি আঁধারেই ডুব দেবো।

"যাহোক, এখনও আমি আলো আর ছায়ার মাঝেই ঘুবি, আমি জানি না এ কি প্রভাত না গোধূলি। আমি এক পেয়ালা সুবা ঢেলে দেবাব মতো ক'রে, আমার ছাই-ধূসব হাত তুলতে পাবি কেবল। যে সময়ে আমি সময়ের দিশা হাবাব, আমি একলাই চলে যাব বহু দূবে।

"হায়! এ যদি গোধূলি হয়, কালো বাত্রি নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করবে, আর এ যদি প্রভাত হয় দিনের আলোয় আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

"বন্ধু, সময় এসেছে।

"আঁধারের মাঝে শূন্যে বেড়াতে আমি যাই।

"তুমি এখনও আমার কাছে কিছু উপহার প্রত্যাশা কর। আমার কি আছে দেবার? যদি তুমি জোর কর, তুমিও সেই একই আঁধার ও শূন্যতা পাবে। কিন্তু আমি চাইব এ কেবল অন্ধকার হোক, যা তোমার দিবালোকে হারাতে পারে। আমি চাইব এ কেবল শূন্যতা হোক, যা কখনও তোমার হৃদয় অধিকার করবে না।

"আমি যা চাইব বন্ধু, তা হ'ল—

"আমি একাকী বহু দূরে সেই অন্ধকারে চলে যেতে চাই, যেখানে শুধু তুমিই নও, অন্য ছায়ারাও থাকবে না। সেখানে কেবল আমি নিজেই আঁধারে ডুবে থাকব। সে জগত হবে সম্পূর্ণই আমার।"

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯২৪।

ভিখারি

আমি একটা উঁচু, ভাঙা দেয়ালের গা ঘেঁসে, সূক্ষ্ম ধূলোর ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছি। আরো অনেক লোকও একা একা হাঁটছে। হঠাৎ বাতাস বয়ে আসে এবং দেয়ালের উপরে লম্বা গাছের পাতা-না-ঝরা ডালগুলো আমার মাথার উপরে আন্দোলিত হয়।

হঠাৎ দমকা বাতাস বয় আর ধূলো সর্বত্র ছড়ায়।

একটা শিশু আমার কাছে ভিক্ষা চায়। পরণে তার অন্যদের মত আস্তরণ দেওয়া পোষাক এবং তাকে মোটেই অসুখী মনে হয় না। তবুও সে পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে আমার পথ রোধ করে আর ঘ্যাণ ঘ্যাণ ক'রতে ক'রতে আমার পেছন পেছন আসে।

আমি তার কণ্ঠস্বর অপছন্দ করি, অপছন্দ করি তার ব্যবহার। তার বিমর্ষহীনতা আমার খারাপ লাগে, মনে হয় এ যেন একটা খেলা। যেভাবে সে ঘ্যাণ ঘ্যাণ ক'রে আমাকে অনুসরণ করে তাতে আমি বিরক্ত হই।

আমি হেঁটে চলি। আরো অনেক লোকও একা একা হাঁটছে। হঠাৎ দমকা বাতাস বয় আর ধূলো সর্বত্র ছড়ায়।

একটা শিশু ভিক্ষা চায় আমার কাছে। পরণে তার অন্যদের মত আস্তরণ দেওয়া পোষাক এবং তাকে মোটেই অসুখী মনে হয় না, কিন্তু সে বোবা। বোবার মতই সে আমার দিকে তার হাত বাড়ায়।

আমি তার বোবার মত হাত বাড়ানোকে অপছন্দ করি। তাছাড়া, সে বোবা নাও হ'তে পারে; হ'তে পারে এটা তার ভিক্ষা করারই একটা পন্থা।

আমি তাকে ভিক্ষা দিই না। তাকে আমার ভিক্ষা দেবার কোন ইচ্ছা নেই। আমি অন্য সব ভিক্ষা দাতাদের ঊর্দ্ধে। ওর প্রতি আমার কেবল বিরক্তি, সন্দেহ আর ঘৃণাই রয়েছে।

আমি একটা ভাঙ্গা মাটির দেয়ালের গা ঘেঁসে হাঁটছি। মাঝে পড়ে আছে কিছু ভাঙা ইট এবং দেয়ালের অদূরে আর কিছুই নেই। হঠাৎ দমকা বাতাস বয়, শরতের শীত ঢোকে আমার কাপড় ভেদ করে, আর ধূলো সর্বত্র ছড়ায়।

আমি বিস্ময়ে ভাবি ভিক্ষে করতে চাইলে আমার কি পদ্ধতি নেওয়া উচিত। কি গলায় কথা বলব? বোবার কি অভিনয় আমি করব, যদি আমি বোবা সাজি?……

আরো অনেক লোক একা একা হাঁটছে।

আমি কোন ভিক্ষা নেব না, এমনকি ভিক্ষা দেবার ইচ্ছাও করব না। যারা নিজেদের ভিক্ষাদাতাদের চেয়ে ঊর্দ্ধে মনে করেন তাদের কাছ থেকে আমি বিরক্তি, সন্দেহ আর ঘৃণাই শুধু পাব।

আমি নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার সাথে ভিক্ষে করব……।

অবশেষে আমি শূন্যতা পাব।

হঠাৎ দমকা বাতাস বয়, আর ধূলো সর্বত্র ছড়ায়। আরো অনেক লোক একা একা হাঁটছে।

ধূলো, ধূলো………

ধূলো………

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯২৪

আমার হারানো প্রেম

—ক্লাসিক আঙ্গিকে নতুন সারশূন্য কবিতা

আমার প্রেয়সী থাকে পাহাড়ের গায়ে,
আমি তাকে দেখতে আকুল, অথচ পাহাড়গুলো কী ভীষণ উঁচু ;
অসহায় আমি মাথা নোয়াই আর ভিজে যায় আমার গাউন
ঝর্ণার মতো অশ্রুপ্রবাহে।
আমাকে দিয়েছে সে পশমী ওড়না এক, উৎফুল্ল প্রজাপতি ভরা।
কী আমি দেব তাকে ? কয়েকটা পেঁচা।
কেন জানি না, আমাকে বিস্ময়ে রেখে
ফিরে যায় সে মুখ ভার ক'রে।

আমার প্রেয়সী থাকে শহরের বুকে,
আমি তাকে দেখতে আকুল, কিন্তু লোকারণ্যে আমার ভয় ;
এবং আমি যখন নিরুপায় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকি
আমার কানের পাশে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুবিন্দু।
রেখার বাঁধনে ধরা একজোড়া ল্যাজঝোলা পাখি, আমাকে তার উপহার;
মধুমাখা ফলে ভরা একটি ডাল, আমার উপহার তাকে ;
রুষ্ট সে, ঘুরিয়ে নেয় মুখ তার,
কেন জানি না আর আমি পড়ি অকূল পাথারে।

আমার প্রেয়সী থাকে নদীর কিনারে.
আমি তাকে দেখতে আকুল, অথচ নদীর জল ভীষণ গভীর ;
অসহায় আমি মাথা উঁচু করে থাকি আর অশ্রুবিন্দু
সিক্ত ক'রে তোলে আমার কোটের বুক।
আমাকে দিয়েছে সে সোনার ঘড়ির চেন,
আমি তাকে দিই স্বেদ ঝরানোর ভেষজ ;
রুষ্ট সে, ফিরিয়ে নেয় মুখ তার,
কেন জানি না আর আমি ভুগি স্নায়ুরোগে।

আমার প্রেয়সী থাকে এক ধনীর প্রাসাদে,
আমি তাকে সেখানে দেখতে যেতে আকুল অথচ নেই আমার গাড়ি ;
নিরুপায় আমি মাথা নাড়াই, আর আমার অশ্রু এখন
ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এখানে ওখানে।
আমায় দিয়েছে সে গোলাপ গুচ্ছ, আর আমি
তাকে তুলে দিই উপহার এক, বাদামী সাপের ;
রুষ্ট সে, ফিরে চলে যায় আমার কাছ থেকে—
কেন ?! নিয়ে যাক শয়তান তাকে !

অক্টোবর ৩, ১৯২৪ — অনুবাদ : দেবব্রত পাল।

প্রতিশোধ

মানুষের চামড়া সম্ভবত এক মিলিমিটারের চেয়েও কম মোটা। এবং তার নীচে, যে সব গুটিপোকা ঘনিষ্টভাবে জড়সড়ো হয়ে থেকে একে অপরের উপর দিয়ে দেয়াল বেয়ে গুটিগুটি ওপরে উঠে যায়, তার চেয়েও ঘন রক্তের ধমনীর জালে উষ্ণ লাল রক্ত ছুটে চলে, উষ্ণতা ছড়ায়। আর এই উষ্ণতা দিয়েই লোকে একে অপরকে মুগ্ধ করে, রোমাঞ্চিত ও আকর্ষণ করে। তাদের অদম্য ইচ্ছা থাকে পরস্পরকে আদর, চুম্বন ও আলিঙ্গন করার যাতে তারা জীবনের চূড়ান্ত আনন্দের মাদকতা উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু এই পাতলা রক্তিম আভাযুক্ত চামড়ার ভেতর দিয়ে সূক্ষ্ম ছুরির একটা আঘাতেই সেই উষ্ণ লাল রক্ত তীরের মতো ফিন্‌কি দিয়ে বেড়িয়ে তার সমস্ত উষ্ণতা নিয়ে সরাসরি ভাসিয়ে দেবে সেই ঘাতককে ; তারপর সেই বরফ শীতল নিঃশ্বাস, সেই পাণ্ডুর ঠোঁটের দৃশ্য তাকে বিহ্বল করে দেবে, দেবে তাকে জীবনের এক স্বর্গীয় চূড়ান্ত আনন্দ ; আর সেই আহত প্রাণ, সেও ডুবে যাবে জীবনের এক স্বর্গীয় চূড়ান্ত আনন্দে।

সেইভাবে দুজন মানুষ, নগ্ন হয়ে, তীক্ষ্ণ ছোরা হাতে ধরে, বিশাল নির্জন প্রান্তরে পরস্পর মুখোমুখী হয়।

দুজনেই দুজনকে আলিঙ্গন করবে। একে অপরকে হত্যা করবে…।

চারিদিক থেকে, দেয়াল বেয়ে ওঠা গুটিপোকার মতো জড়োসড়ো হয়ে অথবা নোনতা মাছের মাথা বয়ে নিয়ে যাওয়া পিঁপড়ের মতো, পথিকরা দ্রুত সেখানে জড়ো হয়। তাদের সকলের পরণে সুন্দর পোষাক কিন্তু হাত খালি। তবুও চারিদিক থেকে তারা দ্রুত সেখানে আসে, এবং বেপরোয়াভাবে ঘাড় বাড়িয়ে যেই আলিঙ্গন বা হত্যাকাণ্ড দেখে তাদের চোখের পরিতৃপ্তি ঘটায়। অবশ্য সেটা ঘটার আগেই তারা তাদের জিহ্বায় সেই ঘাম অথবা রক্তের স্বাদ পেয়ে যায়।

যাহোক, সেই দুজন মানুষ নগ্ন হয়ে, তীক্ষ্ণ ছোরা হাতে ধরে, বিশাল নির্জন প্রান্তরে পরস্পর মুখোমুখী হয়। তারা আলিঙ্গন করে না, খুনোখুনি করে না, আর এমনকি তারা আলিঙ্গন বা খুন করার কোন ইচ্ছাও প্রকাশ করে না।

সেই দুজন মানুষ এইভাবে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের পূর্ণ, জীবন্ত শরীর প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে, তবুও তারা আলিঙ্গন বা খুন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

পথিকরা একঘেঁয়ে বোধ করে। তারা অনুভব করে বিরক্তি তাদের রোমকূপের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে। তারা অনুভব করে বিরক্তি তাদের হৃদয় থেকে রোমকূপ দিয়ে বেড়িয়ে সমস্ত নির্জন প্রান্তরে ছেয়ে যাচ্ছে এবং অপরের শরীরে তা প্রবেশ করছে। তাদের গলা ও জিভ গরমে শুকিয়ে যায়, ঘাড় ক্লান্ত হয়। অবশেষে তারা একে অপরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় এবং ক্রমে ক্রমে সরে পড়ে। তারা এত অবসন্ন বোধ করে যে তারা যেন জীবনের অর্থই হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর যা পড়ে থাকে তা হ'ল বিশাল নির্জন প্রান্তর, আর তার মাঝে দুজন মানুষের নগ্ন হয়ে, তীক্ষ্ণ ছোরা হাতে মরণোন্মুখ অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা। তারা পথিকের অবসাদ দেখে, তাদের রক্তপাত হীন হত্যাকাণ্ড দেখে তাদের সেই চোখের তৃপ্তি ঘটায় যা মৃত মানুষের চোখের মত। এবং তারা চিরকালের জন্য জীবনের স্বর্গীয়, চূড়ান্ত আনন্দে ডুবে থাকে।

ডিসেম্বর ২০, ১৯২৪

প্রতিশোধ (২)

যেহেতু তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র ভাবেন, ইহুদীদের রাজা ভাবেন, তাই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রতে হবে।

সৈন্যরা তাঁকে এক টুকবো বেগুনে রংয়ের কাপড় পরায়, মাথায় পরতে দেয় কাঁটাব মুকুট এবং তাঁকে আনন্দ করতে বলে। তারপর তারা শব দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত কবে, গায়ে থুতু দেয়, এবং তাঁর সামনে নতজানু হয়। তাঁকে উপহাস করার পর, তাবা তাঁর বেগুনে রংয়ের কাপড়ের টুকবোটা খুলে নেয় এবং তাঁকে আগের মতই তার নিজেব কাপড় পরতে দেয়।

দেখ কিভাবে তাবা তাঁব মাথায় আঘাত করে, গায়ে থুতু দেয়, তাঁর সামনে নতজানু হয় —।

তিনি সুগন্ধী নিযাস মেশানো সুরা পান কববেন না। ইহুদীরা তাদেব ঈশ্বরের পুত্রেব প্রতি কি ব্যবহার করে তার আস্বাদ পাবার জন্য তিনি শান্ত থাকতে চান এবং তিনি তাদের ভবিষ্যৎকে করুণা করতে কিন্তু বর্তমানকে ঘৃণা করতে চান।

চারিদিকে ঘৃণা, করুণ জঘন্য।

হাতুড়ির আঘাত শোনা যায়, এবং পেরেকে তাঁর হাতের তালু বিদ্ধ হ'য়। কিন্তু এইসব বেচারা প্রাণীরা যে তাদেব ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রছে, এই সত্য তাঁর যন্ত্রণার উপশম ঘটায়। হাতুড়িব আঘাত শোনা যায়, এবং একটা হাড় ভেঙ্গে পেরেক তাব পায়ের গোড়ালি ভেদ করে, যাতে যন্ত্রণা ধাবিত হয় তাঁর হৃদপিণ্ড, মজ্জার ভিতর দিয়ে। কিন্তু, এইসব জঘন্য প্রাণীরা যে তাদেরই ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করে, এই সত্য তাঁর যন্ত্রণায় তাঁকে আরাম দেয়।

ক্রুশ উপরে তোলা হয়। তিনি বাতাসে ঝুলতে থাকেন।

তিনি সুগন্ধী নির্যাস মেশানো সুরা পান করেন নি। ইহুদীরা তাদের ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি কি ব্যবহার করে তার আস্বাদ পাবার জন্য, তিনি শান্ত থাকতে চান। এবং তিনি তাদের ভবিষ্যৎকে করুণা ক'রতে কিন্তু বর্তমানকে ঘৃণা করতে চান।

সমস্ত পথচারীর তাঁকে অপমান করে, অভিশাপ দেয়, প্রধান পুরোহিত

ও শিক্ষকরাও তাঁকে বিদ্রূপ করে, তাঁরই সাথে ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছে দুটো চোরও তাঁকে উপহাস করে।

এমনকি যাদেরকে তাঁর সাথে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে……।

চারিদিকে ঘৃণা, করুণ জঘন্য।

তাঁর হাত ও পায়ের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তিনি সেই সব করুণ প্রাণীগুলোর দুঃখ আস্বাদ করেন, যারা ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করছে এবং সেই জঘন্য লোকগুলোর আনন্দ উপভোগ করেন, যারা ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে এবং যারা জানে যে ঈশ্বরের পুত্র মৃত্যুমুখে। তাঁর ভগ্ন হাড়ের থেকে হঠাৎ একটা নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁর হৃদয় ও মজ্জার মধ্যে দিয়ে তীরবেগে ছুটে যায়, তাঁকে মহান আনন্দ ও সমবেদনায় উন্মত্ত করে।

সমবেদনা ও ঘৃণার নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁর নাভিশ্বাস হয়।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আছে অন্ধকার।

"হে ভগবান, হে ভগবান, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছ ?"

ভগবান তাঁকে পরিত্যাগ ক'রেছেন আর তাই আসলে তিনি মানুষেরই পুত্র। কিন্তু ইহুদীরা মানুষের পুত্রকেও ক্রুশবিদ্ধ ক'রছে।

যারা বেশীরভাগ রক্ত নষ্ট করে ও নোংরা ছড়ায়,তারা ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করে না, কিন্তু তারা মানুষের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করে।

ডিসেম্বর ২০, ১৯২৪

আশা

হৃদয় আমার অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গ।

কিন্তু আমার হৃদয় খুব প্রশান্ত, এর মাঝে প্রেম নেই, ঘৃণা নেই, আনন্দ-বিষাদ নেই, শব্দ-বর্ণ নেই।

বোধহয় আমি বৃদ্ধ হচ্ছি। এটা কি সত্যি নয় যে আমার চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে? এটা কি সত্যি নয় যে আমার হাতে কাঁপন লাগছে? তাহলে

নিশ্চয়ই আমার আত্মারও হাত কাঁপতে থাকবে। নিশ্চয়ই আমার আত্মারও চুল সাদা হতে থাকবে।

কিন্তু এই ঘটনা ঘটছে অনেক বছর ধরে।

একবার, তার আগে, আমার হৃদয় রক্তের গান, রক্ত ও লোহা, আগুন ও বিষ, পুনরুত্থান ও প্রতিহিংসার স্রোতে প্লাবিত হয়েছিল। তারপর হঠাৎই আমার হৃদয় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু ব্যতিক্রম ছিল যখন মাঝে মাঝে আমি স্বেচ্ছায় কোন অর্থহীন, আত্মপ্লাবনকারী আশায় সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করতাম। আশা, আশা—শূন্যতার মাঝে কালো রাত্রির আক্রমণকে রোধ করতে আশাকেই আমি বর্ম করেছিলাম। অবশ্য আমি জানতাম এই বর্মের পেছনে তখনও ছিল কালো রাত্রি আর শূন্যতা। অথচ তবুও আমি ধীরে ধীরে যৌবন অপচয় করেছিলাম।

আমি অবশ্যই জানতাম যে আমার যৌবন বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে আমার চারিদিকে যৌবন তখনও বর্তমান: তারা ও চাঁদের আলো, শীর্ণ পতিত প্রজাপতি, আঁধারের বুকে ফুল, পেঁচার শবযাত্রার পূর্বাভাস, নাইটিংগেলের রক্তের মাঝে ক্রন্দন, হাস্যের অর্থহীনতা, প্রেমের নাচন……। যদিও হয়ত তা বিষাদ ও অনিশ্চয়তার যৌবন, তবুও তা যৌবন ঠিকই।

তবে কেন এ এখন এত নিঃসঙ্গ? এটাই কি কারণ যে আমার চারিদিকের যৌবনও বিদায় নিয়েছে, আর বিশ্বের সব যুবারা বৃদ্ধ হয়েছে?

শূন্যতার মাঝে আমাকে একাকী কালো রাত্রিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। পেট্যাফি স্যাণ্ডোরের (১৮২৩-৪৯) 'আশার সংগীত' শুনে, আমি আশার বর্মকে রেখে দিই:

> "আশা কি? এক পতিতা মাত্র!
> সকলের মোহময়ী, সকলের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়,
> তোমার কোন অমূল্য ধন—তোমার যৌবন—
> তাকে সঁপে দেবার পরই—সে তোমায় ছেড়ে যাবে।"

পঁচাত্তর বছর পার হয়ে গেছে, যখন এই মহান গীতিকাব্যের কবি ও হাঙ্গেরীর দেশপ্রেমিক, পিতৃভূমির জন্য কসাকদের বর্শার মুখে প্রাণ দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর মৃত্যু করুণ, আরও করুণ হল যে তাঁর কবিতা এখনও মরেনি।

কিন্তু—জীবন এতই শোচনীয় যে পেট্যফির মত একজন সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন মানুষকেও সবশেষে কালো রাত্রির সামনে থামতে হয়েছিল এবং পেছনে দূরের সূর্যোদয়ের দিকে তাকাতে হয়েছিল।

'তিনি বলেছিলেন, "আশার মত হতাশাও নিষ্ফল অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়"।

যদি আমি এখনও এই অহংকার নিয়েই থাকি, যা আলোও নয় আঁধারও নয়, তাহলে আমি সেই বিষাদময় ও অনিশ্চিত যৌবনই চাইব যা বিদায় নিয়েছে, যদিও তা আমার চারিদিকেই আছে। কারণ যদি একবার আমার চারিদিকের যৌবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আমার নিজের বৃদ্ধ বয়সও বিলীন হ'য়ে যাবে।

কিন্তু এখন তারাও নেই চাঁদনীও নেই, নেই কোন শীর্ণ পতিত প্রজাপতি, নেই কোন হাসির অর্থহীনতা, নেই প্রেমের নাচন। যুবকরা খুবই শান্ত।

তাই আমাকে একাই এই শূন্যতার বুকে কালো রাত্রিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এমনকি যদি আমি চারদিকে যৌবন নাও দেখতে পাই, আমি অবশেষে নিজের বৃদ্ধ বয়সেই একবার শেষ আন্দোলন করব। কিন্তু কালো রাত্রি কোথায়? এখন তারাও নেই, চাঁদনীও নেই, নেই কোন হাসির অর্থহীনতা, নেই প্রেমের নাচন। যুবকেরা খুব শান্ত। আর আমার সামনে একটাও প্রকৃত কালো রাত্রি নেই।

আশার মত হতাশা নিষ্ফল অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নববর্ষের দিন, ১৯২৫

তুষার

দক্ষিণের বৃষ্টি কখনও শীতল, উজ্জ্বল তুষার কণায় জমাট বাঁধে না। যে সব মানুষ পৃথিবীকে দেখেছে তারা এটাকে গতানুগতিক ব্যাপার মনে করে; বৃষ্টিও কি এটাকে দুর্ভাগ্য মনে করে? ইয়াংসির দক্ষিণের তুষার অত্যন্ত ভেজা ও

মনোরম, ঠিক বসন্তের প্রথম আগমনী বার্তার মত অনির্বচনীয়, অথবা স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে যুবতী মেয়ের পূর্ণ বিকাশের মতো। তুষারাচ্ছন্ন নির্জন বনভূমিতে ফোটে রক্তলাল ক্যামেলিয়া, সবুজের ছোঁয়ালাগা পাণ্ডুর, সাদা, কুলের পুষ্পমুকুল আর সোনালী ঘণ্টার মতো শীতের কুলের ফুল; আর তুষারের নীচে কান পেতে থাকে শীতল সবুজ গুল্ম। সেখানে অবশ্যই কোন প্রজাপতি নেই, আর ক্যামেলিয়া ও কুলের পুষ্পমুকুল থেকে মধু নিতে মৌমাছিরা আসে কি, আসে না, ঠিক মনে নেই আমার। কিন্তু আমি চোখের সামনে দেখতে পাই তুষারাবৃত নির্জন বনভূমিতে ফুটে আছে শীতের ফুলেরা, মৌমাছিরা ব্যস্তভাবে ছুটে যায় এদিক ওদিক,—আমি তাদের গুণগুণ গুঞ্জন শুনি।

সাত আটটা শিশু জড়ো হয় তুষারের বুদ্ধ বানাতে। তারা তাদের ছোট ছোট লাল আঙ্গুলে মুখের উষ্ণ বাতাস দেয়। আঙ্গুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে আদাগাছের নতুন পাতার মতো রক্তলাল হয়ে গেছে। যখন তারা সফল হ'তে পারে না, কারো বাবা এসে সাহায্য করেন। শিশুদের চেয়েও বুদ্ধ উঁচু; আর যদিও এখন এটা একটা নাশপাতি আকারের ঢিবি যা থেকে লাউও হ'তে পারে বুদ্ধও হ'তে পারে, তবুও এটা অপূর্বরকম সাদা ও ঝলমলে। নিজেদের জলকণায় আটকে থেকে সম্পূর্ণ মূর্তিটা ঝিকমিক, ঝিলমিল ক'রছে। শিশুরা ফলের মতো পাথর দিয়ে এর চোখ বানায়, আর ঠোঁটে দেবার জন্য কারো মায়ের প্রসাধনী বাক্স থেকে লাল রুজ চুরি করে আনে। আর এখন ইনি সত্যিই একজন সম্মানিত বুদ্ধ। ঈষৎ উজ্জ্বল চোখ আর লাল ঠোঁট নিয়ে তিনি তুষারের উপর বসে আছেন।

পরের দিন কয়েকটি শিশু একে দেখতে আসে। তাঁর সামনে হাততালি দিয়ে তারা মাথা নোয়ায় আর হাসে। বুদ্ধদেব ঠিক সেখানেই বসে থাকেন, একাকী। একটা উষ্ণ দিনে এর দেহের চামড়া গলে যায়, কিন্তু একটা শীতের রাত এঁর গায়ে বরফের আর এক প্রলেপ দিয়ে দেয়, যতক্ষণ না এটাকে একটা অস্বচ্ছ স্ফটিকের মতো দেখায়। অবশেষে কয়েকটা পরপর উষ্ণ দিনে তাঁকে আর চেনা যায় না, আর তাঁর ঠোঁট থেকে লাল রং মুছে যায়।

কিন্তু উত্তরে যে তুষার কণা ঝরে, শেষ পর্য্যন্ত তা মিহি বা বালির মতো থেকে যায় এবং কখনও জমাট বাঁধে না,—বাড়ির ছাদে, মাটিতে কিংবা শুকনো ঘাসে, যেখানেই ছড়ানো থাক না। ঘরের ভেতরের চুল্লীর উত্তাপে ছাদে

ছড়ানো বরফের কিছুটা গলে যায়। যখন পরিস্কার আকাশের নীচে হঠাৎ কোন ঘূর্ণি ঝড় ওঠে, তখন বাকীরা উদ্দামভাবে উড়ে বেড়ায়, কোন আগুনের শিখার চারিদিকে ঘন কুয়াশার মত ওগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। যতক্ষণ না আকাশটা ভরে যায় তারা ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে, আর যত তারা ঘুরে ঘুরে 'ওপরে ওঠে, সমস্ত আকাশ ঝলমল ক'রে ওঠে।

সীমাহীন নির্জন বনভূমিব উপর, স্বর্গের শীতল প্রকোষ্ঠের ভিতবে এই ঝলমলে ঘূর্ণায়মান প্রেতাত্মা, বৃষ্টিরই অশরীরী আত্মা····

হ্যাঁ, এটা নিঃসঙ্গ তুষার, মৃত বৃষ্টি, বৃষ্টিব প্রেতাত্মা।

জানুয়ারী ১৮, ১৯২৫

ঘুড়ি

পিকিংয়ের শীতকাল আমাকে হতাশ ও নিরুৎসাহ করে দেয়ঃ মাটিতে পুরু হয়ে তুষার পরে এবং পাতাহীন গাছের ফ্যাকাশে শাখাগুলো সদর্পে মাথা তুলে দেয় পবিস্কার নীল আকাশের দিকে, আর দূরে একটা কি দুটো ঘুড়ি ভেসে বেড়ায়।

দেশে আমার বসন্তকালেব প্রথম দিকটাই ঘুড়ি ওড়াবার সময়। যখন তুমি বায়ুচালিত চাকার শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পাবে, উপরে তাকাও, দেখবে হয় একটা ধূসব রংয়েব কর্কট-ঘুড়ি বা একটা হালকা নীল রংয়েব বহুপদী ঘুডি। অথবা তুমি দেখতে পাবে একটা নিঃসঙ্গ সতরঞ্চ ঘুড়ি,—যার বায়ু চালিত চাকা নেই এবং খুবই নীচু 'দিয়ে উড়ছে। দেখে মনে হয় যেন শোচনীয়ভাবে একা ও পরিত্যক্ত। অবশ্য এই সময়ে উইলো গাছেরা নতুন পাতা মেলেছে, এবং প্রথম পাহাড়ী পীচ গাছে কুঁড়ি ধবেছে। শিশুদের সৌখীন কাজের ফলে আকাশে উড়ে তারা একসাথে বসন্তের উষ্ণতার অভাবটুকু পূবণ করে। আমি এখন কোথায়? আমার চারিদিকে ভয়ঙ্কর শীতের রাজত্ব, আর এখন এই উত্তরের আকাশে, আমার বহুদিন ভুলে থাকা গৃহের বহুদিনের বিদায় নেওয়া বসন্ত ভেসে বেড়াচ্ছে।

তবুও আমি কখনও ঘুড়ি ওড়ানো পছন্দ করি নি। ঘুড়ি পছন্দ করা তো দূরের কথা, বস্তুতঃ, ওগুলোকে আমি অপদার্থ ছেলেদের খেলার জিনিস বলেই অপছন্দ করেছিলাম। আমার ছোট ভাই ছিল ঠিক তার উল্টো। তার বয়স ছিল অবশ্যই প্রায় দশ বছর, প্রায়ই অসুখে ভুগতো আর শরীর ভয়ংকর রোগা। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী আনন্দ ছিল ঘুড়িতে। একটা ঘুড়ি কিনতে না পারায় এবং আমি নিষেধ করায়, সে এক সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, তীব্র কামনায় তার ছোট্ট ঠোঁট দুটো ফাঁক করে, আকাশের দিকে মোহিত হ'য়ে তাকিয়ে থাকত। যদি কোন দূরের কর্কট-ঘুড়ি হঠাৎ নীচে নেমে আসত সে ভয়ে চিৎকার করে উঠত; যদি দুটো শতরঞ্চ ঘুড়ির সুতোর প্যাচ খুলে যেত, সে আনন্দে লাফালাফি করত। এটা আমার কাছে অর্থহীন ও ঘৃণ্য ব'লে মনে হয়েছিল।

একদিন আমার মনে হ'ল, আমি আজকাল ওকে খুব বেশী দেখি না, কিন্তু আমি ওকে বাড়ির পেছন দিক থেকে একটা বাঁশ তুলতে দেখেছিলাম। এক ঝলকে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিস্কার হ'য়ে গেল। আমি ছুটে একটা ছোট্ট, পরিত্যক্ত গুদাম ঘরে ঢুকে পড়লাম, এবং নিশ্চিতভাবে, যখন আমি দরজাটা ঠেলে খুললাম, ওকে দেখতে পেলাম ময়লা ভাঙাচোরা জিনিসের মাঝে বসে আছে। ও একটা বড় চৌকো টেবিলের সামনে একটা ছোট টুলের ওপর ব'সেছিল; কিন্তু এখন, ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে, ওর চেহারা পাল্টে গেল এবং ভয়ে সিটকে ওঠল। একটা প্রজাপতি-ঘুড়ির বাঁশের কাঠামো বড় টেবিলটার গায়ে ঠেকানো ছিল। ওটায় এখনও কাগজ সাঁটা হয়নি। অপর দিকে টেবিলের উপর প্রজাপতির চোখের জন্য দুটো বায়ু চালিত চাকা পড়েছিল। এই দুটোই ও এখন লাল কাগজ দিয়ে সাজাচ্ছিল। কাজটা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। আমি ওর গোপনীয়তা প্রকাশ ক'রতে পেরে খুব খুশী হয়েছিলাম; কিন্তু আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম কারণ ও আমাকে অনেকদিন ধরে ঠকিয়েছে, আর বাজে ছেলেদের খেলনা তৈরী করতে এত মন দিয়ে পরিশ্রম ক'রেছে তাই। আমি ঐ কাঠামোটা কেড়ে নিলাম এবং একটা ডানা ভেঙ্গে দিলাম, তারপর চাকা দুটো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলাম। দেহে ও শক্তিতে ও আমার সমকক্ষ ছিল না; তাই অবশ্য আমি পূর্ণ বিজয় অর্জন করেছিলাম। তারপর আমি সদম্ভে গর্বভরে

বেড়িয়ে এলাম আর ও ঐ ছোট্ট ঘরে হতাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে ও কি করেছিল জানি নি বা জানতে ও চাইনি।

অবশেষে আমি এর প্রতিদান পেয়েছিলাম, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার অনেক পরে, যখন আমি ইতিমধ্যেই মধ্য বয়সে পৌঁছে গেছি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি শিশুদের নিয়ে লেখা একটা বিদেশী বই পড়েছিলাম। সেই বই থেকে আমি সেই প্রথম জানতে পেরেছিলাম যে, খেলাই শিশুদের সবচেয়ে ভালো পেশা এবং খেলনা তাদের মঙ্গলময় দেবদূত। তৎক্ষণাৎ আত্মার উপর ছেলেবেলার অত্যাচারের কথা মনে পড়ে গেল, যা আমি কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে ভুলে ছিলাম। আর সেই সময় থেকেই মনে হচ্ছে আমার বুক ভারী হয়ে নীচে আরও নীচে তলিয়ে যাচ্ছে।

আমার হৃদয় ভাঙে নি ; শুধু নীচে আরও নীচে তলিয়ে গেছে।

আমি জানি কিভাবে এই ক্ষতি পূরণ করা যায় : ওকে একটা ঘুড়ি দিয়ে, ঘুড়ি ওড়াবার সম্মতি দিয়ে, ওড়াবার জন্য প্রেরণা দিয়ে এবং ওর সাথে ঘুড়ি উড়িয়ে। আমরা হৈচৈ, দৌড়েদৌড়ি হাসাহাসি করতে পারতাম !…… কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ওরও আমার মত, গোঁফ গজিয়ে গেছে।

আমি ওর ক্ষতিপূরণ করার আর একটা পন্থাও জানি : ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং ওর এই উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা, "কিন্তু আমি তোমাকে আদৌ দোষ দিই নি"। তখন নিশ্চয়ই তোমার বুক হালকা হ'য়ে যাবে। হ্যাঁ এটা করা সম্ভব। একদিন আমাদের দেখা হ'ল। জীবনের কষ্ট আমাদের মুখে তার ছাপ ফেলে দিয়েছে এবং আমার হৃদয় খুব ভারাক্রান্ত হ'য়ে র'য়েছে। আমরা ছেলেবেলাকার ঘটনার কথা নিয়ে আলোচনা করছি এবং আমি এই অধ্যায়টার রেশ টেনে স্বীকার করলাম যে আমি একটা নির্বোধ ছেলে ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ও বলবে, "কিন্তু আমি তোমাকে আদৌ দোষ দিই নি"। তখন আমি ভাবব ও আমাকে ক্ষমা ক'রেছে এবং তারপর থেকে আমার বুক হালকা হ'য়ে যাবে।

ও অবিশ্বাসের হাসি হেসে, যেন অন্য কোন লোকের কোন গল্প শুনছে এইভাবে বলল, "সত্যিইকি এমন ঘটেছিল ?" ওর মন থেকে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

ওর মন থেকে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মুছে গেছিল, তার বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভূতি ছিল না। সেই ক্ষেত্রে, কি ক্ষমা থাকতে পারে ? কষ্ট অনুভূতি ছাড়া ক্ষমা

মিথ্যা। আমার জন্য এখন কি সান্ত্বনা আছে? আমার হৃদয় সব সময় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে।

এখন আবার এই অপরিচিত জায়গার বাতাসেও আমার বাড়ির বসন্ত বিরাজ করছে। এই বসন্ত আমাকে সেই বহুদিনের ফেলে আসা শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার সাথে নিয়ে আসছে এক অবর্ণনীয় বিষন্নতা। আমার ভয়ংকর শীতেই লুকিয়ে থাকা ভাল ছিল। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে আমার সমস্ত ধারেই শীতের আধিপত্য এবং এমনকি এখনও এ আমাকে কঠোর শাস্তি ও শীতলতা প্রদান করছে।

জানুয়ারী ২৪, ১৯২৫

একটা সুন্দর গল্প

বাতির শিখা ধীরে ধীরে ক'মে আসছে, আর যে খুব বেশী মোম নেই এ রই ইঙ্গিত, আর ভালো জাতের মোম না হওয়াতে ধোঁয়াতে এর মধ্যেই মনি কালো হ'য়ে গেছে। চারিদিকে বোমা ফাটছে এবং আমাকে ঘিরে য়েছে সিগারেটের ধোঁয়া। একঘেঁয়ে অন্ধকার রাত।

আমি চোখ বন্ধ করলাম ও আমার চেয়ারের পেছনে হেলান দিলাম, আর াথমিক নোটবই'* নামে বইটা ধরে হাতটা হাঁটুর উপর রাখলাম।

আর এই ঘুম ঘুম অবস্থার মধ্যে আমি একটা সুন্দর গল্প দেখতে পেলাম।

এটা একটা সুন্দর, মনোরম, রোমাঞ্চকর গল্প। অনেক সুন্দর সুন্দর লোক বং অনেক মনোরম জিনিস আকাশে মেঘের আস্তরণের মতো মিশে আছে, সংখ্য ফুটফুটে তারার মতো শোভাবর্ধন ক'রে অসীম দিগন্তে ছড়িয়ে াছে।

আমার যেন মনে পড়ছে, আমি একটা ছোট্ট নৌকো বেয়ে একটা পুরোণো জপথ ছাড়িয়ে চলছিলাম। দুই তীরে ট্যালো গাছ আর কচি ধানের চারা, না ফুল, মুরগী, কুকুর, ঝোপঝাড় ও শুকনো গাছপালা, খড় দিয়ে ছাওয়া কুঁড়ে

---

* শু চিয়েন (৬৫৯-৭২৯) ও অন্যান্যদের তাং বংশের উপর একটা বই।

ঘর, প্যাগোডা, বুদ্ধ-মন্দির, চাষী ও গাঁয়ের মহিলা, গাঁয়ের মেয়ে, শুকোনোর জন্য ঝুলিয়ে রাখা কাপড় চোপড়, সাধু, ছোবরার জামা, বাঁশ-কাঠির টুপি, আকাশ, মেঘ আর বাঁশ। ফিকে নীল জলের ওপর এসবেরই প্রতিফলন পড়ছিল। দাঁড়ের প্রতিটি আঘাতে তারা ঝলমলে রোদ মেখে ও জলের মাছ ও আগাছার সাথে মিশে—সব একসাথে ভেসে যাচ্ছিল। তারপর সব ছায়া ও বস্তু কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে বেড়ে যাচ্ছিল ও এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল ; কিন্তু যে মুহূর্তে তারা মিশে যাচ্ছিল, তারা আবার ছোট হয়ে তাদের আগের চেহারায় ফিরে আসছিল। যেমন গ্রীষ্মের মেঘের প্রান্তভাগ সূর্যের আলোয় ঝালর তৈরী করে ও তীব্রভাবে পারদ রংয়ের শিখা ছড়ায়, ঠিক তেমনি প্রত্যেক ছায়ার প্রান্তভাগই ছিল অস্পষ্ট। যে সব নদী বেয়ে আমি পাড়ি দিয়েছি, সবই ছিল এই রকম।

আর যে গল্পটা আমি এখন দেখছি তাও এই রকম। জলের পটভূমিকায় নীল আকাশ নিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসই পরস্পরের মিশ্রণে, বুননে, এমনভাবে চির-চলমান, চির-বর্ধমান, যে আমি এর সীমা দেখতে পাচ্ছি না।

নদীর ধারে শুকনো উইলো গাছের নীচে কয়েকটা অনিবিড় ফুলগাছ দেখে মনে হয় নিশ্চয়ই গাঁয়ের মেয়েরা লাগিয়েছে। জলে ভাসমান বড় বড় ক্রিমসন ফুল এবং বাহারি সব লাল ফুল, হঠাৎ ছড়িয়ে প'ড়ে ও বিস্তৃত হ'য়ে রক্তলাল জলের স্রোতে টানা লম্বা সারি দিয়ে ভেসে চলে—কিন্তু তাদের কোন আভা নেই। খড় দিয়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর, কুকুর, প্যাগোডা, গাঁয়ের মেয়েরা, মেঘেরাও……ভাসছে। এখন বড় বড় ক্রিমসন ফুলগুলোর প্রত্যেকটা সারি দিয়ে বিস্তৃত হ'য়ে লাল সিল্কের ফিতের মতো ঢেউ খেতে লাগল। ফিতেগুলো কুকুরের সাথে, কুকুরগুলো সাদা মেঘের সাথে এবং সাদা মেঘ গাঁয়ের মেয়েদের সাথে বুনন রচনা করল……। চোখের পলকেই তারা আবার সংকুচিত হবে। কিন্তু বাহারি সব লালফুলের প্রতিফলন ইতিমধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং সেগুলো প্যাগোডা, গাঁয়ের মেয়ে, কুকুর, খড় দিয়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর ও মেঘের সাথে বুনন রচনা করবার জন্য ছড়িয়ে পড়ল।

এখন যে গল্পটা আমি দেখতে পাচ্ছি তা আরও পরিস্কার, আরও সুন্দর, মনোরম, মুগ্ধকর ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ মুক্ত আকাশের উপরে অসংখ্য সুন্দর মানুষ ও সুন্দর বস্তু রয়েছে। আমি তাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি এবং সবাইকে চিনতে পারছি।

আমি তাদের দিকে আরও নিবিড়ভাবে তাকাতে উন্মত হয়েছি…

কিন্তু যখন আমি তাদের দিকে আরও নিবিড়ভাবে তাকাতে উন্মত, হাৎ চোখ খুলে দেখতে পাই যে মেঘের আবরণে ভাঁজ পড়ছে ও জট পাকাচ্ছে, কেউ যেন জলের মধ্যে একটা বিরাট পাথর ফেলেছে, যাতে ঢেউগুলো লাফিয়ে ওঠে এবং সমস্ত প্রতিচ্ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। বইটা ফসকে প্রায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, আমি চিন্তা না করেই তাড়াতাড়ি বইটা ধরে ফেল্লাম। আমার চোখের সামনে তখনও কিছু রামধনু রংয়ের খণ্ড খণ্ড প্রতিচ্ছবি ভেসে বেড়ায়।

এই সুন্দর গল্পটাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম। আর যে সব খণ্ড খণ্ড ছবি তখনও ছিল, আমি তাদের ধরতে চাইলাম, তাদের সুবিন্যস্ত ক'রে চিরস্থায়ী ক'রতে চাইলাম। আমি বইটা উল্টে পাশে রেখে দিলাম, সামনে ঝুঁকে আমার কলমটা নিলাম। কিন্তু এখন আমার সামনে একটাও প্রতিচ্ছবি নেই। আমি যা দেখতে পেলাম তা হ'ল প্রদীপের মৃদু আলো। আমি আর সেই ছোট্ট নৌকায় নেই।

কিন্তু এখনও আমি সেই সুন্দর গল্পটা দেখতে পাচ্ছি, সেই মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার রাত্রি……।

ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯২৫

পথিক

সময়ঃ কোন এক সন্ধ্যা।

স্থানঃ কোন একটা স্থান।

চরিত্রঃ

বৃদ্ধলোকঃ বয়স প্রায় সত্তর, চুল ও দাড়ি সাদা, একটা কালো জোব্বা।

মেয়েঃ বয়স প্রায় দশ, পিঙ্গল কেশ, কালো চোখ, সাদা কাপড়ের উপর কালো চৌকো ছাপ মারা জোব্বা।

পথিক : বয়স প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ, ক্লান্ত ও খিটখিটে, জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি, কালো গোঁফ ও অবিন্যস্ত চুল ; ছেঁড়া কালো জ্যাকেট ও প্যান্ট, খালি পায়ে জীর্ণ ছেঁড়া জুতো। হাতে একটা ঝোলা, তারই সমান লম্বা একটা বাঁশের লাঠিতে ভর দেয়।

পুব দিকে কয়েকটা গাছ ও ভাঙা জিনিসপত্তর ; পশ্চিম দিকে একটা পরিত্যক্ত কবর খানা ; এই দুটোর মাঝে একটা সরু পথ। একটা রাস্তার দিকে মুখ করা ছোট মাটির কুঁড়ে ঘরের দরজা খোলা। দরজার পাশে একটা মরা গাছের গুঁড়ি।

(মেয়েটা বৃদ্ধকে তার বসে থাকা গুঁড়ি থেকে উঠতে সাহায্য করতে যাবে।)

বৃদ্ধ : এই, খুকী ! থামলি কেন ?

মেয়ে (পুবদিকে তাকিয়ে) : ঐ দেখ ! কে যেন আসছে।

বৃদ্ধ : ঠিক আছে। আমাকে ভেতরে নিয়ে চল। সূর্য ডুবছে।

মেয়ে : আমি……একটু দেখবো।

বৃদ্ধ : কি মেয়েরে তুই ! রোজ স্বর্গ, মর্ত, ও বাতাস দেখিস এতে কি তোর সাধ মেটে না ? এর চেয়ে ভাল দেখার জিনিস আর কিছুই নেই। তবুও দেখবি কে আসছে। সূর্যাস্তের পর যেই আসুক সে কোন মঙ্গল করতে পারে না……আমাদের ভেতরে যাওয়াই ভাল।

মেয়ে : কিন্তু লোকটা খুব কাছে এসে গেছে। আঃ, একটা ভিখিরী।

বৃদ্ধ : ভিখিরী ? না, তা হ'তে পারে না।

(পথিকটি পুব দিকের ঝোপ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসে এবং মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ক'রে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধের কাছে আসে।)

পথিক : শুভ সন্ধ্যা, মহাশয়।

বৃদ্ধ : ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা।

পথিক : মহাশয়, আমাকে এক কাপ জল দিতে পারেন ? হেঁটে হেঁটে তেষ্টা পেয়ে গেছে। আর এখানে কোন ডোবা বা খানাও দেখতে পেলাম না।

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, তা বটে। আপনি বসুন না। (মেয়েকে) খুকী, জল নিয়ে আয়। কাপটা যেন পরিষ্কার থাকে, দেখিস।

(মেয়েটি নীরবে কুঁড়ে ঘরে ঢুকে যায়)

বৃদ্ধ : আপনি দয়া করে বসুন না, আগন্তুক। আপনার নাম কি ?

পথিক : আমার নাম? তা আমি জানি না। স্মরণকাল থেকে আমার যা মনে আছে, আমি আমিই; তাই আমি আমার আসল নাম জানি না। আমি যখন আমার পথে চলি, লোকে তাদের ইচ্ছে মত আমাকে এ নামে, সে নামে ডাকে। কিন্তু সেগুলো আমার মনে নেই, আর একই নামে আমাকে কেউ দুবার ডাকে নি।

বৃদ্ধ : ওহ! আচ্ছা, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

পথিক (দ্বিধাভরে): আমি জানি না। স্মরণকালে থেকে আমার যা মনে আছে, আমি এই ভাবেই হাঁটছি।

বৃদ্ধ : ঠিক আছে। তাহ'লে আমি জানতে পাবি কি আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

পথিক : নিশ্চয়ই পারেন, ব্যাপার হ'চ্ছে, আমি জানি না। স্মরণকাল থেকে আমার যা মনে আছে, দূরে কোনো এক জায়গায় যাবার জন্য, আমি এই ভাবেই হাঁটছি। আমার যা মনে আছে তা হ'ল, আমি অনেকটা পথ হেঁটেছি আর এখন এখানে এসেছি। আমি ঐ পথ ধবে এগিয়ে যাব (সে পশ্চিম দিক দেখায়)! (মেয়েটা সাবধানে একটা কাঠেব কাপে করে জল আনে এবং তাকে দেয়।)

পথিক (জল নিয়ে): ধন্যবাদ, খুকী।

(সে দু ঢোকে জল খায়, ও কাপটা ফেরত দেয়।)

ধন্যবাদ, খুকী। এই ধরণের দয়ালু লোকের দেখা পাওয়া দুর্লভ। আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, কিভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।

বৃদ্ধ : এতখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেব কোন প্রয়োজন নেই। এতে আপনার কোন উপকার হবে না।

পথিক : না, এতে আমার কোন উপকার হবে না। কিন্তু এখন আমার খুব ভাল লাগছে। আমি এগিয়ে যাব। আপনি নিশ্চয়ই এখানে অনেকদিন আছেন, মহাশয় আপনি কি বলতে পারেন সামনের জায়গাটা কেমন?

বৃদ্ধ : সামনে? সামনে কবরখানা।

পথিক (চমকে): কবরখানা?

মেয়ে : না, না না! ওখানে অনেক বুনো গোলাপ আছে, লিলি ফুল আছে। আমি প্রায়ই ওখানে খেলতে যাই, ওদের দেখতে যাই।

পথিক (পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে, মনে হয় হাসছে) ঃ হ্যাঁ ওখানে অনেক বুনো গোলাপ ও লিলি আছে ; আমি নিজে প্রায়ই ওদের দেখে আনন্দ পাবার জন্য ওখানে যেতাম। কিন্তু ওগুলো কবর। (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়, কবরখানার পরে কি আছে ?

বৃদ্ধ : কবরখানার পরে ? তা আমি জানি না। আমি ওর পরে কখনও যাই নি।

পথিক : আপনি জানেন না !

মেয়ে : আমিও জানি না।

বৃদ্ধ : আমি দক্ষিণ, উত্তর আর পুব দিকই কেবল জানি—ঐ যেদিক থেকে আপনি এসেছেন। ঐ জায়গাগুলো আমি সবচেয়ে ভালো জানি, আর ওগুলোই আপনার মতো লোকের পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা। আমার কথায় রাগ করবেন না ; কিন্তু আপনি ইতিমধ্যেই এত ক্লান্ত যে, আমার মনে হয় আপনি ফিরে গেলেই ভাল করবেন; কারণ আপনি যদি চলতে থাকেন, তবে আপনি হয়ত কখনও আপনার পথের শেষে পৌছতে পারবেন না।

পথিক : আমি পথের শেষে কখনও নাও পৌছতে পারি ?··· সে এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে, তারপর চমকে ওঠে।) অসম্ভব ! আমি এগিয়ে যাবই। আমি ফিরে গেলেও, যশস্বী ব্যক্তি ছাড়া কোন স্থান পাবনা, জমিদার ছাড়া কোন স্থান পাব না, নির্বাসন ও ও কারাগার ছাড়া কোন স্থান পাবো না, মিথ্যে হাসি ও মেকী কান্না ছাড়া কোন স্থান পাবো না। আমি তাদের ঘৃণা করি। আমি ফিরে যাবো না।

বৃদ্ধ : আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আপনি বুকফাটা কান্নাও দেখতে পারেন, কিছু প্রকৃত সমবেদনা।

পথিক : না। আমি তাদের বুকফাটা কান্না দেখতে চাই না। আমি তাদের সমবেদনা চাই না।

বৃদ্ধ : তাহ'লে, (সে তার মাথা নাড়ে) আপনাকে এগিয়ে যেতেই হবে

পথিক : হ্যাঁ, আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া, দূরে একটা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এই কণ্ঠস্বর আমাকে বার বার এগিয়ে যেতে বলছে এবং আমায় ডাকছে যাতে আমি না থামি। অসুবিধাটা হচ্ছে

হেঁটে হেঁটে আমার পায়ে এমনভাবে ঘা হয়েছে ও কেটে গেছে, যে আমার অনেকটা রক্ত বেড়িয়ে গেছে। (সে একটা পা তুলে বৃদ্ধকে দেখায়।) আমার আর বেশী রক্ত নেই ; আমি কিছুটা রক্ত পান করতে চাই। কিন্তু কোথায় তা পাব ? তাছাড়া, আমি যার তার রক্ত পান করতে চাই না। আমাকে রক্তের পরিবর্ত্তে পরিপূরক হিসেবে জল খেতে হবে। পথে সব সময়ই জল পাওয়া যায় ; আসলে কখনও জলের অভাব দেখা দেয়নি। কিন্তু আমার শক্তি বেড়িয়ে যাচ্ছে, কারণ আমার রক্তে এখন অতিরিক্ত জল হ'য়ে গেছে। আজ যে আমি কম হেঁটেছি, তার কারণ, আমি একটাও জলের ডোবা পাইনি।

বৃদ্ধ : সেটা কারণ নাও হ'তে পারে। সূর্য অস্ত গেছে ; আমার মনে হয়, আমার মতো, আপনার কিছু বিশ্রাম নিলে ভাল হ'ত।

পথিক : কিন্তু সেই দূরের কণ্ঠস্বর আমাকে এগিয়ে যেতে বলছে।

বৃদ্ধ : আমি জানি।

পথিক : আপনি জানেন ? ঐ কণ্ঠস্বর আপনি চেনেন ?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ। আগে সে আমাকেও ঐ ভাবে ডেকেছিল মনে হচ্ছে।

পথিক : সেই একই কণ্ঠস্বর যে আমাকে এখন ডাকছে ?

বৃদ্ধ : তা আমি বলতে পারি না। সে আমাকে অনেকবার ডেকে ছিল, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনি, তাই সে ডাকা বন্ধ ক'রেছে ; এইটুকুই শুধু আমার মনে আছে।

পথিক : ও, আপনি তাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন······(সে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে, চমকে ওঠে এবং শোনে।) না ! আমি যাবোই। আমিই বিশ্রাম নিতে পারি না। কপাল খারাপ তাই আমার পা এরকম খারাপ অবস্থায় এসেছে। (সে যাবার জন্য তৈরী হয়।)

মেয়ে : এই নাও ! (সে তাকে একটুকরো কাপড় দেয়) তোমার পাটা বেঁধে নাও।

পথিক : ধন্যবাদ, খুকী। (সে কাপড়ের টুকরোটা নেয়।) সত্যি······ সত্যি এ রকম দয়া দুর্লভ। এটা দিয়ে আমি অনেক দূর হাঁটতে পারব। (সে একটা পাথরের উপর বসে এবং তার পায়ের

গোড়ালিতে সেটা বাঁধতে উদ্যত হয়।) না, এতে হবে না। (সে পায়ের কাছে চেষ্টা চালায়।) এটা ফিরিয়ে নাও খুকী। এটা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা যাবে না। তাছাড়া, এটা সত্যিই খুব নরম। আর কিভাবে যে তোমায় ধন্যবাদ দিই বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধ : ওকে ধন্যবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নেই ; এতে আপনার কোন উপকার হবে না।

পথিক : না, এতে তোমার কোন উপকার হবে না। কিন্তু আমার কাছে এটাই সুন্দরতম ভিক্ষে। দেখুন, এটার সাথে তুলনা করার মত আর কিছু জানা আছে আপনার ?

বৃদ্ধ : ব্যাপারটায় আপনি অত গুরুত্ব না দিলেও পারতেন।

পথিক : জানি। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। আমার মনে হয় এটাই আমার কায়দা। যদি আমায় ভিক্ষে নিতে হত, আমি মৃতদেহ সন্ধানকারী উপরে উড়ে বেড়ান এমন একটা শকুনে পরিণত হতাম যে, নিজের চোখে এই মেয়েটার মৃত্যু দেখতে চাইতাম। অথবা আমি এই মেয়েটি ছাড়া আর সবারই মৃত্যু কামনা করতাম। এমনকি আমার নিজেরও, কারণ এটাই আমার প্রাপ্য। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি এখনও এতটা ক্ষমতাশালী হইনি। এমন কি যদি আমি তা হতামও, আমি মেয়েটার এই পরিণতি চাইতাম না, কারণ এই রকম একটা পরিণতি তারা সবচেয়ে অপছন্দ করে। আমার মনে হয় এটাই ঠিক। (মেয়েটির প্রতি।) এই কাপড়ের টুকরোটা ঠিকই আছে, তবে একটু ছোট। তাই আমি এটা তোমায় ফিরিয়ে দিই।

মেয়ে (পিছিয়ে, ভয়ে) : আমি এটা চাই না! তুমি নাও।

পথিক (প্রায় হেসে) : ওহ্……আমি এটা ধরেছি বলে ?

মেয়ে (মাথা নাড়ে ও তার ঝোলার দিকে দেখায়) : এর ভেতর রাখ। মজা হবে।

পথিক (ভয়ে পিছিয়ে) : কিন্তু এটা পিঠে নিয়ে কিভাবে হাঁটবো ?

বৃদ্ধ : যেহেতু বিশ্রাম নিচ্ছেন না, তাই আপনি কিছু বইতে পারবেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন, তারপরই ঠিক হ'য়ে যাবেন।

পথিক : ঠিক বলেছেন, বিশ্রাম……(সে চিন্তা করে, তারপর চমকে ওঠে ও শোনে।) না, আমি পারি না! আমার যাওয়াই বরং ভাল।

বৃদ্ধ : আপনি বিশ্রাম নিতে চান না ?

পথিক : চাই।

বৃদ্ধ : তবে কিছুটা বিশ্রাম নিন না কেন।

পথিক : কিন্তু আমি পারি না……।

বৃদ্ধ : আপনি কি এখনও মনে করেন আপনার যাওয়া উচিত ?

পথিক : হ্যাঁ, আমার যাওয়াই বরং ভালো।

বৃদ্ধ : খুব ভাল কথা, আপনাকে তা'হলে যেতেই হবে।

পথিক (সোজা হয়) : বেশ, আমি তাহ'লে বিদায় নিই। আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। (মেয়েটির প্রতি।) খুকী, আমি তোমাকে এটা ফিরিয়ে দিচ্ছি। লক্ষ্মীটি এটা ফিরিয়ে নাও।

(ভয়ে মেয়েটা তার হাত পেছনে টেনে আনে এবং কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিতে চায়।)

বৃদ্ধ : আপনি এটা নিন। যদি খুব ভারী লাগে, যে কোন সময় এটা কবরখানায় ফেলে দিতে পারেন।

মেয়ে (এগিয়ে আসে) : ওহ্, না, তা হবে না!

পথিক : না, তা হবে না।

বৃদ্ধ : বেশ, তাহ'লে এটাকে কোন একটা গোলাপ বা লিলি ফুলের গাছে ঝুলিয়ে দেবেন।

মেয়ে (হাততালি দেয়, হাসে) : চমৎকার!

পথিক : আহ………।

(কিছু সময়ের জন্য নীরবতা।)

বৃদ্ধ : তাহ'লে বিদায়। আপনি শান্তিতে থাকুন। (সে দাঁড়ায় ও মেয়ের দিকে ফেরে) খুকু, আমাকে ভেতরে নিয়ে চল। দেখ, সূর্য এরমধ্যে ডুবে গেছে। (সে দরজার দিকে ফেরে।)

পথিক : আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। আপনারা শান্তিতে থাকুন। (সে কয়েক পা এগোয়, গভীর চিন্তামগ্ন, তারপর চমকে উঠে।) কিন্তু আমি পারি না! আমাকে যেতেই হবে। আমার বরং

যাওয়াই ভাল……! (মাথা তুলে, সে দৃঢ় পদক্ষেপে পশ্চিমের দিকে যাত্রা করে।)

(মেয়েটি বৃদ্ধকে কুঁড়ে ঘরে যেতে সাহায্য করে, তারপর দরজা বন্ধ করে। পথিক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নির্জন বনভূমির দিকে যাত্রা করে, এবং তার পরই রাত্রি নেমে আসে।)

মার্চ ২, ১৯২৫

মৃত আগুন

আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি বরফের পাহাড়ের উপর দৌড়চ্ছি।

এটা একটা বিশাল, উঁচু পাহাড়, উপরের বরফশীতল আকাশকে ছুঁয়েছে; আর আকাশটা হিমায়িত মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। প্রত্যেকটা মেঘের টুকরো যেন একটা মাছের আঁশ। পাহাড়ের পাদদেশটা বরফের অরণ্য, যার পাতা ও ডালপালা পাইন ও সাইপ্রেস গাছের মত। আর সবকিছু হিম-শীতল, ছাইয়ের মতো ধূসর।

কিন্তু হঠাৎ আমি বরফের উপত্যকায় পড়ে গেলাম।

উপরে, নীচে, চারিদিকের সব কিছু হিম-শীতল, ছাইয়ের মতো ধূসর। তবুও সেই ফ্যাকাশে বরফের উপর পড়েছে অসংখ্য লাল প্রতিবিম্ব, প্রবালের ঢেউয়ের মতো একে অপরের সাথে গাঁথা। আমার পায়ের নীচে তাকিয়ে আমি একটা আগুনের শিখা দেখতে পেলাম।

এটা একটা মৃত আগুন। এর আগুনের আকার আছে, কিন্তু চূড়ান্ত স্থির, সম্পূর্ণ জমাট বাঁধা, ঠিক মাথায় জমাট বাঁধা কালো ধোঁয়া নিয়ে প্রবালের শাখার মতো। ঈষৎদগ্ধ, দেখে মনে হয় এইমাত্র আগুনের চুল্লী থেকে বেড়িয়ে এসেছে। আর তাই, এ চারিদিকের বরফের উপর প্রতিফলন ফেলে ও প্রতিফলিত হয়ে, অসংখ্য প্রতিবিম্বতে পরিণত হয়েছে—বরফের উপত্যকাকে প্রবালের মতোই লাল ক'রেছে।

আঃ!

শিশুর মতো, আমি চিরকাল দ্রুত ধাবমান জাহাজের মন্থনে ওঠা ফেনা দেখতে অথবা জ্বলন্ত চুল্লী থেকে বেড়িয়ে আসা আগুনের উদ্‌গিরণ দেখতে ভালবাসি। আমি শুধু যে ওগুলোকে দেখতে চাই তাই নয়, আমি খুব পরিষ্কারভাবে ওগুলোকে দেখতে চাই। দুঃখের কথা ওগুলো সব সময়ই পরিবর্তিত হয়, কখনও একটা নির্দিষ্ট আকারে থাকে না। যতই গভীরভাবে আমি তাকাই না কেন, আমি কখনও একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পাই না।

হে মৃত আগুন, অবশেষে এখন তোমাকে আমি পেলাম!

আমি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য যেইমুহূর্তে, মৃত আগুনটাকে তুলে নিলাম, এর শীতলতা আমার আঙ্গুলগুলোকে অসাড় করে দিল; কিন্তু যন্ত্রণা সহ্য করে আমি তাকে জোর করে আমার পকেটে পুরে নিলাম। তক্ষুনি সমস্ত উপত্যকা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। আর সেই সাথেই আমি বিস্মিত হ'য়ে ভাবলাম কি ভাবে এই স্থান ত্যাগ করব।

আমার শরীর থেকে একটা পাকানো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এলো। সেটা একটা তারের সাপের মতো উপরে উঠতে লাগল। সাথে সাথে অসংখ্য রক্ত-লাল অগ্নিশিখা বিশাল অগ্নিকাণ্ডের মতো আমাকে বেষ্টন ক'রে, চারিদিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। নীচের দিকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ দেখলাম যে ঐ মৃত আগুনটা আবার জ্বলছে। আমার কাপড়ের ভিতর দিয়ে জ্বলে বরফের মাটিতে প্রবাহিত হ'চ্ছে।

আগুনটা বলে উঠল, "আঃ বন্ধু। তোমার উষ্ণতা দিয়ে তুমি আমাকে জাগিয়েছ"।

আমি তৎক্ষনাৎ তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে সে বলল, "মানুষেরা আমাকে এই বরফের উপত্যকায় পরিত্যাগ করেছিল। যারা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তারা ইতিমধ্যেই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে গেছে। আমি ঐ বরফে জমে মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিলাম। যদি তুমি আমাকে উত্তাপ দিয়ে আবার প্রজ্বলিত না করতে, অচিরেই আমি শেষ হ'য়ে যেতাম"।

"আমি আনন্দিত যে তুমি জেগেছ। আমি এখনই ভাবছিলাম কি ক'রে এই বরফের উপত্যকা ছেড়ে যাওয়া যায়, এবংআমি তোমাকে আমার সাথে

নিয়ে যেতে চাই যাতে তুমি আর কখনও জমে শীতল না হতে পার বরং চিরকাল ধরে জ্বলতে পার ”।

“ওহ্, না ! তা'হলে আমি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব” ।

“তুমি পুড়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেলে, আমি দুঃখ পাব। আমি বরং তোমাকে এখানেই রেখে যাই” ।

“ওহ্, না ! আমি ঠাণ্ডায় জমে মরে যাব ।”

“তাহলে কি করতে হবে” ?

সে পাল্টা প্রশ্ন ক'রল “তুমি নিজে কি করবে ?”

“আমি আগেই বলেছি, আমি এই বরফের উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে চাই ।”

“তা'হলে আমার পুড়ে নিঃশেষ হওয়াই শ্রেয় !”

সে লাল ধূমকেতুর মতো লাফিয়ে উঠল, এবং আমরা দুজনে ঐ উপত্যকা ছেড়ে চলে এলাম। হঠাৎ একটা বিশাল পাথর বোঝাই গাড়ি ছুটে এল এবং এর চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে আমি মরে গেলাম। কিন্তু আমি দেখার আগেই গাড়িটা বরফের উপত্যকায় পড়ে গেল ।

“আঃ ! তুমি আর ঐ মৃত আগুনকে দেখতে পাবে না ।” কথা বলতে বলতে আমি আনন্দে হেসে উঠলাম। মনে হ'ল যে— যা হাওয়া উচিত তাই হ'য়েছে ব'লেই আমি আনন্দিত ।

এপ্রিল ২৩, ১৯২৫

কুকুরের প্রত্যুত্তর

আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি একটা সরু গলি দিয়ে হাঁটছি। পরণে আমার ছেঁড়া জামাকাপড়, ভিখিরির মতো ।

একটা কুকুর আমার পেছনে চিৎকার শুরু ক'রে দিল ।

আমি ঘৃণায় পেছনে তাকিয়ে ওর উদ্দেশ্যে গালাগাল দিয়ে বললাম : “এই ! থাম্ ! থুতু-চাটা খেঁকি কুত্তা !”

কুকুরটা মুচকি হাসল।

সে বলল, "আরে না! আমি এই বিষয়ে মানুষের সমকক্ষ নই"।

"কি!" প্রচণ্ড রাগে আমি অনুভব করলাম যে এটা একটা চূড়ান্ত অপমান।

"আমার বলতে লজ্জা করছে যে আমি এখনও জানিনা কিভাবে তামা ও রূপা, সিল্ক ও সুতি, অফিসার ও সাধারণ নাগরিক, প্রভু ও তার ভৃত্য, ... দের মধ্যে পার্থক্য করা যায়"।

আমি পেছন ফিরে পালাতে লাগলাম।

"একটু দাঁড়াও! আমরা আর একটু কথা বলি......" পেছন থেকে চিৎকার করে সে আমাকে থামতে বলল।

কিন্তু স্বপ্নের শেষে নিজের বিছানায় ফিরে না আসা পর্যন্ত, আমি যত দ্রুত সম্ভব সোজা ছুটতে লাগলাম।

এপ্রিল ২৩, ১৯২৫

যে সুন্দর নরক শেষ হ'ল

স্বপ্নে দেখলাম নরকের পাশের এক নির্জন প্রান্তরে আমি একটা বিছানায় শুয়ে আছি। সমস্ত প্রেতাত্মাদের গভীর অথচ সুশৃংখল আর্তনাদের সাথে আগুনের লেলিহান শিখার গর্জন, তেলের টগবগানি এবং লোহার শানিত শলাকার সংঘর্ষের শব্দ মিশে একটা বিরাট, মাতালকরা ঐক্যতান উঠে তিনটি অঞ্চলেই নীচের তলার রাজ্যের শান্তি ঘোষণা করছে।

আমার সামনে একজন মহান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সুন্দর ও ও সদাশয়। তাঁর সমস্ত শরীর আলোকোজ্জ্বল; কিন্তু আমি জানি—তিনি শয়তান।

"সব শেষ হয়ে গেল! সব শেষ হয়ে গেল! হতভাগ্য প্রেতাত্মারা তাদের সুন্দর নরক হারিয়েছে"। ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে কথাগুলো বলে, তিনি আমাকে তার জানা একটা গল্প বলার জন্য বসলেন।

যখন স্বর্গ ও পৃথিবী ছিল মধুরবর্ণের তখন শয়তান ঈশ্বরকে জয় করল এবং নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করল। তার হাতেই ছিল স্বর্গ, পৃথিবী ও নরক। তিনি একদিন সশরীরে নরকে এলেন এবং সকল প্রেতাত্মাদের উপর উজ্জ্বল আলোক পাত করে, তার মাঝখানে বসলেন।

"নরক বহুদিন থেকে অবহেলিত: কাঁটা গাছগুলো নিজের ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, ফুটন্ত তেলের প্রান্তে আর টগবগানি নেই, মাঝে মাঝে কেবল বিশাল আগুন থেকে কিঞ্চিত সবুজ ধোঁয়া নির্গত হ'চ্ছে, এবং দূরে এখনও যে বিষাক্ত ফুলগুলো ফুটছে, সেগুলো খুব ছোট, বিবর্ণ ও করুণ। কিন্তু তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ মাটি ভয়ংকর ভাবে পুড়ে গেছে এবং স্বাভাবিক কারণেই তার উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেছে।

"ঠাণ্ডা তেল ও ঈষৎ উষ্ণ আগুনের মাঝে জেগে থাকা প্রেতাত্মারা, শয়তানের আলোতে দেখল নরকের ছোট ফুলগুলো, কি বিবর্ণ ও করুণ এবং তারা সম্মোহিত হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁদের মানুষের পৃথিবীর কথা মনে পড়ল এবং কেউ জানে না কত বছর ধরে বিবেচনা করার পর, তারা মানবজাতির উদ্দেশ্যে, নরককে ধিক্কার জানিয়ে প্রচণ্ড আর্তনাদ করল।

"শয়তানের বিরুদ্ধে যে অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিল, তাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে মানুষ সাড়া দিল ও জেগে উঠল। বজ্রের চেয়েও গম্ভীর লড়াইয়ের হুংকার তিনটি অঞ্চলকে পূর্ণ করে দিল। অবশেষে বিরাট ছলনা ও ধূর্ত প্রলোভনে, সে শয়তানকে নরক ছাড়তে বাধ্য করল। শেষ বিজয়ের পর, মানবজাতির পতাকা নরকের দরজার উপর উত্তোলিত হ'ল।

"যখন মানুষের দূত নরককে স্বীকৃতি দিতে এল তখনও প্রেতাত্মারা একসাথে বিজয় উল্লাস করছিল। মানুষের শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে সে নরকের বুকে এসে বসল এবং প্রেতাত্মাদের শাসন করতে লাগল।

"যখন প্রেতাত্মারা নরককে ধিক্কার দিয়ে আরেকবার আর্তনাদ করল, তারা মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল। এই অপরাধের জন্য চির নরক-বাসের দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়ে তারা কাঁটা গাছের মাঝে নির্বাসিত হ'ল।

"মানুষ তখন নরকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে উঠল, তার কর্তৃত্ব শয়তানদেরকেও ছাড়িয়ে গেল। ষণ্ড-মস্তিষ্ক দৈত্যকে সর্বোচ্চ পদ দিয়ে সে শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করল। সে আগুনে আরও জ্বালানী দিল, তলোয়ারের

পাহাড়গুলোকে আরো ধারালো করল এবং পূর্বের অধঃপতনকে দূর ক'রে সে নরকের চেহারায় সার্বিক পরিবর্তন আনল।

"তৎক্ষণাৎ বিষ ফল গাছের ফুল নিশ্চিহ্ন হ'ল। আগের মতই তেল ফুটতে লাগল, আগের মতই তলোয়ার ধারালো হ'ল, আগের মতই আগুন জ্বলে উঠল এবং প্রেতাত্মারা আগের মতই যন্ত্রণায় আর্তনাদ ও ছটফট করতে লাগল, যতক্ষণ না কেউ সেই হারিয়ে যাওয়া সুন্দর নরকের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার সময় না পায়।

"এটা ছিল মানুষের সফলতা, প্রেতাত্মাদের দুর্ভাগ্য...

"বন্ধু, আমার মনে হয় তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ। হ্যাঁ তুমি একজন মানুষ। আমি অবশ্যই বন্য জন্তু ও দৈত্যদের খুঁজতে যাবো.........।"

জুন ১৬ ১৯২৫

সমাধি লিপি

স্বপ্নে দেখলাম আমি একটা কবরের পাথরের ফলকের সামনে দাড়িয়ে তার উপর খোদাই করা লেখা পড়ছি। দেখে মনে হয় ফলকটা বেলে-পাথরে তৈরী, খসে খসে পড়ছে এবং শ্যাওলায় ছেয়ে গেছে। খোদাই করা লিপির অবশিষ্ট খণ্ডগুলোতে লেখা ছিল :

"......গান গাইতে গাইতে, মহা আনন্দে পান-ভোজন করিবার সময় তিনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন; স্বর্গে একটি গহ্বর দেখিয়াছিলেন। চোখে কিছুই দেখেন নাই, নিরাশার মধ্যেই মুক্তি পাইয়াছিলেন......।

"......বিষাক্ত দাঁতওয়ালা সর্পের আকৃতি ধারণ করিয়া একটি অশরীরী আত্মা বিচরণ করে। অপরকে দংশন করিবার পরিবর্তে সে নিজেকেই দংশন করে, আর সেই কারণেই তার মৃত্যু ঘটে...... !"

"......দূর হও !......"

ঘুরে ফলকের পেছন দিকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি নিঃসঙ্গ কবরটাকে

দেখতে পাইনি। এটা বিধ্বস্ত, এর উপর কোন গাছপালা জন্মায় নি। একটা বড় ফাঁক দিয়ে আমি মৃতদেহটা দেখতে পেলাম। এর নাড়িভুড়ি বের করা, হৃদপিণ্ড নেই, যকৃতও নেই। অথচ এর মুখে আনন্দ বা বিষাদের কোন চিহ্ন নেই, আছে একটা ধোঁয়াটে রহস্যময়তা।

সন্দেহ ও ভয় নিয়ে সরে পড়ার আগেই, ফলকের পেছন দিকের খোদাই করা, ভাঙা লিপিটার দিকে আমার নজর পড়ল :

"......এর প্রকৃত স্বাদ জানার আশায়, খাবার জন্যে আমি আমার হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে বার করে এনেছিলাম। কিন্তু কি নিদারুণ যন্ত্রণা, কি কি ক'রে আমি এর স্বাদ বর্ণনা করব ?......

"......যন্ত্রণা ক'মে এলে, আমি ধীরে ধীরে হৃদপিণ্ডটার আস্বাদ গ্রহণ ক'রছিলাম। কিন্তু যেহেতু ততক্ষণে এটা বাসী হ'য়ে গেছে, কি ভাবে আর আমি এর প্রকৃত স্বাদ বুঝতে পারবো ?......

"......উত্তর দাও। নয়তো, যাও !......"

আমি চলে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু কবরের মধ্যে মৃতদেহটা ওঠে বসল। ঠোঁট না নেড়ে ওটা বলে উঠল :

"যখন আমি ছাই হয়ে যাব, তুমি আমায় হাসতে দেখবে !"

আমি ছুটে চলে এলাম, ভয়ে সাহস করে পেছনে তাকাতে পারলাম না, কারণ হয়ত দেখতে পাব ওটা আমার পেছন পেছন আসছে।

জুন ১৭, ১৯২৫

অবমূল্যায়নের শিহরণ

স্বপ্ন দেখলাম যে আমি স্বপ্ন দেখছি। আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কিন্তু গভীর রাতে আমার সামনে আছে একটা সবদিক বন্ধ কুটীরের ভেতরের পরিবেশ। এবং তবুও আমি দেখতে পাচ্ছি যে ছাদের উপর ঘন হয়ে লতা গাছ জন্মেছে।

কাঠের টেবিলে বসানো মোমবাতির গোলোকটা সত্ত সত্ত পরিষ্কার করা হ'য়েছে, ঘরটা আলোয় খুব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সেই আলোতে, একটা নড়বড়ে কোচের উপর একটা আগন্তুকের, লোমশ, পেশীবহুল মাংসল শরীরের নীচে, একটা ঈষৎ অক্ষম, দুর্বল শরীর, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, দুঃখ, অপমান ও আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চামড়া কুঁকড়ে গেলেও কিন্তু তা উজ্জ্বলতা বিকিরণ করছে; বিবর্ণ গাল ঈষৎ রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে, যেন সীসার উপর তরল লাল রুজের প্রলেপ।

এদিকে বাতির শিখাও ভয়ে অনেকখানি কুঁচকে গেছে, কারণ ইতিমধ্যেই পুবদিক আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। যাহোক, বাতাসে তখনও ক্ষুধা, যন্ত্রণা, দুঃখ, অপমান ও আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে, স্পন্দিত হচ্ছে……।

"মা!" দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দে জেগে উঠে একটা প্রায় দু বছরের বাচ্চা মেয়ে খড়ের পরদা দিয়ে পৃথক করা ঘরের এক কোণার মেঝে থেকে চিৎকার করে উঠল।

"এখনও সকাল হয়নি। তুমি ঘুমোও," তার মা অস্থির হ'য়ে, জোর দিয়ে বলল।

"আমার খিদে পেয়েছে, মা। পেট ব্যথা করছে। আমরা কি আজ কিছু খেতে পাব?"

"হ্যাঁ, পাব। ফেরিওয়ালা এলে আমি তোমার জন্য কিছু তিলের পিঠে কিনবো।" পুনরায় নিশ্চিত হ'বার জন্য সে তার হাতের মুঠোর মধ্যে রূপোর ছোট পয়সাটা শক্ত করে ধরল। যখন সে ঘরের কোণায় গেল, দুঃখে তার মৃদু কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। মাদুরটাকে সরিয়ে সে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে নড়বড়ে কোচের উপর শুইয়ে দিল।

"এখনও সকাল হয় নি। তুই ঘুমো।" কথা বলতে বলতে সে অসহায় ভাবে ভাঙা ছাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলল।

হঠাৎ বাতাসে আর একটা ঢেউ খেলে গেল। প্রথম ঢেউয়ের সাথে সংঘাতে এবং দ্রুত আবর্তনে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় উঠল, যা সব কিছু গ্রাস করল এমনকি আমাকেও বাদ দিল না, ফলে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না।

গোঙাতে গোঙাতে আমি জেগে উঠলাম। জানলার বাইরে সর্বত্র রূপালী জ্যোৎস্না পড়েছে। মনে হয় ভোর হ'তে এখনও অনেক দেরী।

আমি বুঝতে পারছি না কোথায় আছি, কিন্তু যেহেতু আমার সামনে, গভীর রাতে একটা সবদিক বন্ধ কুটিরের ভেতরের পরিবেশ, আমি বুঝতে পারলাম যে এটা আমার আগের স্বপ্নেরই—পরবর্তি অংশ। যাহোক, স্বপ্নের ভেতরেই বহু বছর পার হয়ে গেছে। এখন কুটিরটি বাইরে ও ভিতরে সযত্নে রক্ষিত ; এর ভেতরে রয়েছে এক কমবয়সী দম্পতি ও একদল বাচ্চাকাচ্চা। তারা বিরক্তি ও অবজ্ঞাভরে একজন বয়স্কা মহিলার বিরুদ্ধে কথা বলছে।

"তোমার জন্যই আমরা বাইরে মুখ দেখাতে পারি না," লোকটা ক্রুদ্ধস্বরে বলল। "তুমি ভাব ওকে বড় ক'রেছ, কিন্তু, আসলে তুমি ওর সর্বনাশ ক'রেছ। ছোট বেলায় ওর না খেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ছিল।"

"তুমি আমার সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিয়েছ," মহিলাটি চিৎকার করে বলল।

"এবং আমাকেও জড়িয়েছ," লোকটা বলল।

"আর ওদেরকেও জড়িয়েছে," তার স্ত্রী বাচ্চাদের দেখিয়ে বলল।

একটা শুকনো শর নিয়ে খেলা করছিল সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা। সে তখন শরটাকে তলোয়ারের মতো ঘুরিয়ে চিৎকার করে ওঠল :

"খতম কর!"

বয়স্কা মহিলার ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে থাকে, সে চমকে ওঠে, তারপর শান্ত হ'য়ে যায়, আর বর্তমানে সে পাথরের মূর্তির মতো ভাবলেশশূন্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে দরজা খুলে রাতের অন্ধকারের গভীরে হাঁটতে আরম্ভ করে। পেছনে ফেলে যায় সমস্ত উপহাসমূলক টিটকিরি ও নোংরা উচ্চহাসি।

রাতের অন্ধকারের গভীরে হাঁটতে হাঁটতে শেষে সে এক সীমাহীন পতিত জমিতে পৌঁছায়। চারিদিকে পরে আছে পতিত জমি, কেবল অনেক উপরে আছে আকাশ, পাখী নেই, উড়ন্ত পোকামাকড়ও নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন, পাথরের মূর্তির মতো, সে পতিত জমিটার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় আর তার সমস্ত অতীত জীবন মনের মধ্যে ঝলসে ওঠে : ক্ষুধা, যন্ত্রণা, দুঃখ, অপমান ও আনন্দ……সে কাঁপতে থাকে ; অধঃপতন, বিনাশ ও জড়িয়ে পড়া……সে ঘন ঘন থরথর করে কাঁপতে থাকে ; "খতম কর!"……সে শান্ত হয়……। আরেক ঝলকে সে এই সব কিছুকে সূত্রবদ্ধ করে : প্রগাঢ় অনুরাগ ও বিচ্ছিন্নতা, স্নেহের আদর ও প্রতিশোধ, প্রতিপালন ও খতম, আশীর্বাদ ও অভিশাপসমূহ……। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে সে

দুই হাত আকাশের দিকে প্রসারিত করে এবং তার ঠোঁট থেকে একটা আধা-মানবিক, আধা-পাশবিক, আর্তনাদ নির্গত হয়। এই আর্তনাদ মানুষের পৃথিবীর আর্তনাদ নয়, তাই ভাষাহীন।

যখন সে এই ভাষাহীন আর্তনাদ উচ্চারণ করে, তার যে সমগ্র শরীরটা, মূর্তির মতো বিরাট ,কিন্তু এর মধ্যেই ক্ষয়ে জীর্ণ হ'য়ে গেছে, শিহরণে কেঁপে ওঠে। এই সব শিহরণ যা প্রথমে মাছের আঁশের মতো ছোট ছোট ও স্পষ্ট ছিল, ক্রমশঃ তা গণগণে আগুনের উপরে থাকা জলের মতো টগবগ করে ওঠে। আর তৎক্ষণাৎ বাতাসও দূরন্ত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউয়ের মতো আলোড়িত হ'তে আরম্ভ ক'রে।

তারপর উর্দ্ধে সে আকাশের দিকে চোখ মেলে এবং তার ভাষাহীন আর্তনাদ নিস্তব্ধতায় বিলীন হ'য়ে যায়। কেবল তার শিহরণ সূর্যের রশ্মির মতো বিকীর্ণ হ'য়ে চারিদিকের ঘূর্ণি বাতাসের বুকে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যেন এই দূরন্ত ঝড়ের ঝাপটায় তা এই সীমাহীন পতিত জমি ছাড়িয়ে চলে যেতে চায়।

এটা ছিল একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন, তবুও আমি বুঝেছিলাম যে আমার বুকের উপর হাতের চাপ পড়াতেই এমনটা ঘটেছিল। এবং আমি স্বপ্নের ভেতরেই এই প্রচণ্ড শক্তিশালী, ভারী হাত দুটোকে সরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম।

জুন ২৯, ১৯২৫

মত প্রকাশের প্রসঙ্গে

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি একটা প্রাইমারী স্কুলের ক্লাশ ঘরে বসে একটা রচনা লেখার প্রস্তুতি করছি এবং মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞেস করছি কি ভাবে মতামত প্রকাশ করতে হয়।

"এটা কঠিন কাজ!" চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে আড় চোখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বলেন, "তোমাকে একটা গল্প বলি শোন—

"কোন পরিবারে যখন পুত্র জন্মায়, বাড়ির সকলেই আনন্দিত হয়। যখন সে এক মাসের হয়, তারা তাকে অতিথিদের দেখাবার জন্য বাইরে নিয়ে যায়— সাধারণতঃ কোন প্রশংসা শোনবার আশায় তো বটেই।

"কেউ বলেন: 'ছেলেটা ধনী হ'বে।' তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

"কেউ বলেন: 'ছেলেটা একটা অফিসার হবে।' বিনিময়ে তখন তাকেও প্রশংসা করা হয়।

"কেউ বলে: 'ছেলেটা মারা যাবে।' তখন পুরো পরিবার তাকে ধরে মার লাগায়।

"ছেলেটা যে মরবে এটা অবশ্যম্ভাবী, আর ছেলেটা যে ধনী বা অফিসার হবে, এটা মিথ্যাও হ'তে পারে। তবুও মিথ্যাটা পুরস্কৃত হয়, অথচ অবশ্যম্ভাবীতার বিবৃতি প্রহার লাভ করে। তুমি………"

"স্যার আমি মিথ্যে বলতে চাই না, মারও খেতে চাই না। তাহ'লে আমার কি বলা উচিত?"

"সেই ক্ষেত্রে বলবে, 'আহা! ছেলেটিকে দেখ! আমার ভাবায়……… ও, আমার! ওহো! হি হি! হি, হিহিহিহিহিহি'!"

৮, ১৯২৫

মরণের পরে

আমি স্বপ্নে দেখলাম রাস্তার ধারে মরে পড়ে আছি।

আমি কোথায়, কি করে সেখানে গেলাম, বা কি করে মরলাম, এ সমস্তই রহস্যময়। যা হোক, মৃত অবস্থায় সেখানে পড়ে থেকেই জানলাম যে আমি মরে গেছি।

'ছাতার পাখী'রা চিৎকার করছে শুনলাম, তারপর কাকেরাও। মাটির তীব্র গন্ধ বয়ে আনলেও বাতাস খুব টাটকা—নিশ্চয়ই এখন ভোর হবে। আমি চোখ খুলতে চেষ্টা করি, কিন্তু পাতা নড়ে না, মনে হয় যেন ওগুলো আমার নয়। তখন আমি হাত তুলতে চেষ্টা করি, কিন্তু তারও একই অবস্থা।

বুকে আচমকা ভয়ের ছুরিকাঘাত অনুভব করলাম। যখন বেঁচে ছিলাম, আমি এই ভেবে আনন্দ বোধ করতাম যে : যদি মানুষের মৃত্যু কেবল তার চালিকা-স্নায়ুর স্থবিরতা হয়, আর চেতনাবোধ বেঁচে থাকে, সেটা পুরোপুরি মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর হবে। কে জানত যে আমার ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হবে বা আমায় নিজেকেই এর সত্যতা যাচাই করতে হবে ?

আমি পায়ের শব্দ শুনলাম : কেউ পাশ দিয়ে যাচ্ছে। মাথার পাশ দিয়ে একটা চাকা-গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। গাড়িটা বোধহয় ভারী মালে বোঝাই, কারণ এর তীব্র আওয়াজ ও শব্দ আমার স্নায়ুর মধ্যে ঘসা দিয়ে গেল ও আমার দাঁতে দাঁত লেগে গেল। তারপর সব কিছু যেন রক্তলাল হয়ে উঠল : নিশ্চয়ই সূর্য উঠেছে। আমি নিশ্চয়ই তাহলে পূব দিকে মুখ করে আছি। অবশ্য এতে কিছু আসে যায় না। মানুষের কথার বকবকানি —উৎসুক দর্শকবৃন্দ। তাদের ওড়ানো ধুলোর মেঘ আমার নাকে ঢুকে হাঁচির উদ্রেক করেছে। আমি কিন্তু হাঁচতে পারছি না ; আমার ইচ্ছে হচ্ছে আর কি।

তারপর আরও আরও পায়ের শব্দ আসে। সেগুলোর সমস্তই আমার পাশে এসে থামে এবং আরও ফিসফিসানি ওঠে : বেশ একটা ভিড় জমেছে। তারা কি বলে শোনবার হঠাৎ একটা ইচ্ছে অনুভব করি। কিন্তু ঠিক তখনই মনে পড়ল, আমার জীবদ্দশায় আমি প্রায়ই বলতাম যে সমালোচনা নিয়ে ঝামেলার কোন মানে হয় না। সম্ভবতঃ আমি কথার কথা বলতাম। কারণ যেই মুহূর্তে আমি মরে গেলাম, আমি নিজের কথার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম।

কিন্তু যদিও আমি শুনে যেতে লাগলাম, আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না, কারণ মন্তব্যগুলো প্রায় এই রকম :

"মরে গেছে, এ্যা ?……"

"আহা হা হা !……"

"ঠিক আছে !……"

"ওহ্...খুব বিচ্ছিরি......"

একটাও পরিচিত কণ্ঠস্বর না শুনে, খুব আনন্দিত বোধ করছি। নইলে কেউ কেউ নিশ্চয়ই আমার জন্য শোক প্রকাশ করত, কেউ কেউ খুশী হত; কেউ রাতের খাওয়ার পর গল্প করার মতো কিছু বেশী খোরাক পেত, আর মূল্যবান সময় নষ্ট করত; আর এই সমস্তই আমার খুব খারাপ লাগত। আমাকে এখন কেউ দেখেনি, তাই কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ভাল। মোট কথা আমি কারো কোন ক্ষতি করছি না!

কিন্তু এখন একটা পিঁপড়ে বোধহয় আমার পিঠ বেয়ে উঠছে এবং পিঠে জ্বালা করছে। যেহেতু আমি নড়তে পারছি না, এর হাত থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় আমার নেই। সাধারণ অবস্থায় ঘুরে শুয়েই আমি একে তাড়াতাম। এখন আমার উরুতেও আরেকটা উঠল! তোরা কি করছিস শুনি, বেয়াদপ পোকা!

ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে: একটা গুঞ্জনের শব্দ শুনি এবং একটা মাছি আমার চোয়ালের হাড়ের উপর বসে। এটা কয়েক পা এগিয়ে আসে, তারপর নাকের ডগা চাটবার জন্য উড়ে এসে বসে। "মশাই, আমি কোন বিখ্যাত ব্যাক্তি নই", দুঃখের সাথে মনে মনে বলি। "আপনার গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে আমাকে খুঁজে বার করার কোন প্রয়োজন নেই......।" কিন্তু আমি কথা ব'লতে পারি না। চটচটে জিভ দিয়ে আমার ঠোঁট চাটবার জন্য মাছিটা আমার নাকের ডগা থেকে নেমে আসে। আমি অবাক হই—এটা বোধ হয় ওর প্রেমের প্রকাশ। আরও কয়েকটা আমার ভুরুর উপর জড়ো হয়। ওদের প্রত্যেক পদক্ষেপে, আমার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে—অনেক, অনেক দূর।

একটা দমকা হাওয়া দিয়ে কি যেন একটা ওপর থেকে আমাকে ঢেকে ফেলে আর ওরা সবাই উড়ে পালায়। ওদের যাবার সময় আমি ওদের বলতে শুনি:

"কি করুণ!........."

আমি ক্ষোভে, ঘৃণায় মরে যাই।

মাটিতে ধপ্ করে কাঠের একটা কিছু পড়ার শব্দে ও মাটির কাঁপনে আমি সম্বিত ফিরে পাই। কপালের উপর একটা খড়ের মাদুর পাতা আছে

অনুভব করি। তারপর মাদুর সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমি আবার রৌদ্রের জ্বলন্ত তাপ অনুভব করি।

"ও এখানে মরবে কেন?" কে যেন জিজ্ঞেস করল, শুনলাম।

গলার স্বর এত কাছে যে বক্তা নিশ্চয়ই আমার উপর ঝুঁকে আছে। কিন্তু মানুষের কোথায় মরা উচিত? আমি ভাবতাম যে, যদিও মানুষ এই পৃথিবীতে ইচ্ছামত বাসস্থান ঠিক ক'রতে পারে না, সে অন্ততঃ যেখানে খুশী মরতে পারে। এখন আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তা নয়, এবং প্রত্যেককে খুশী করা অত্যন্ত কঠিন। কি দুঃখের, অনেকদিন হ'য়ে গেল আমার কাছে কাগজ ও কলম নেই; এমন কি আমার কাছে তা থাকলেও আমি লিখতে পারতাম না; আর যদি আমি লিখতেও পারতাম, আমার কোন লেখা প্রকাশ করার কোন জায়গা ছিল না। তাই আমি ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম।

কয়েকজন লোক আমায় তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না তারা কারা। তলোয়ারের খাপের ঝনঝনানি থেকে অনুমান করলাম এখানে পুলিশও আছে, এখানে আমার মরা উচিত হয় নি। আমাকে কয়েকবার উল্টে পাল্টে ঘোরান হ'ল, মনে হ'য় আমাকে ওপরে ওঠাল এবং আবার নামাল। তারপর একটা ঢাকনা বন্ধ করার শব্দ শুনি এবং পেরেক মারা হয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তারা মাত্র দুটো পেরেক মারে। তারা কি এখানে শবাধারে সব সময় দুটো পেরেকই মারে?

"এবার আমি ছয় দেওয়ালেই ধাক্কা খাবো," আমি ভাবি। "পেরেক মেরে দিয়ে আমাকে ভেতরে রাখা হয়েছে। সত্যিই সব শেষ হয়ে গেল। আমার সব শেষ হয়ে গেল!......"

"ভেতরটা খুব গুমট.........", আমি ভাবি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি আগের চেয়ে অনেক শান্ত বোধ করছি, যদিও আমি সঠিক বুঝতে পারছি না আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে কি না। আমার হাতের পিছন দিকে খড়ের মাদুরের ছোঁয়া লাগছে, এবং আমি অনুভব করছি যে এই ধরণের আবরণ খুব খারাপ নয়। আমার কেবল দুঃখ, জানতে পারলাম না কে দয়া করে এই সব খরচ বহন করেছেন। কিন্তু যে বাজে লোকগুলো আমাকে এই শবাধারে ঢুকিয়েছে তারা নিপাত যাক! আমার

জামার একটা কোণা ভাজ খেয়ে পিঠের তলায় ঢুকেছে, কিন্তু ওরা আমার জন্য সেটা সোজা করে দেয় নি, আর এখন ওটা অত্যন্ত অস্বস্তিকরভাবে আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। তোমরা যে এরকম অবহেলাভরে কাজ করছ, তোমরা কি মনে কর যে মৃত মানুষের কোন্ অনুভূতি নেই? বাঃ!

বেঁচে থাকা সময়ের চেয়েও আমার শরীর এখন অনেক বেশী ভারী বলে মনে হ'চ্ছে, তাই ভাঁজ করা জামার উপর এর চাপ আমাকে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও অনেক বেশী অস্বস্তি দিচ্ছে। যাহোক, আমি চিন্তা করি যে অচিরেই আমাকে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে হবে, না হয় শীঘ্রই আমি পচতে আরম্ভ করব; তাই এটা খুব কষ্টকর হবে না। এই অবসরে আমি বরং নীরবে ধ্যান করি।

"মশাই, কেমন আছেন? আপনি কি মৃত?"

অত্যন্ত চেনা কণ্ঠস্বর। আমি চোখ মেলে দেখি যে, লোকটা পোকুচাই বইয়ের দোকানের বার্তাবাহক। আমি ওকে কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে দেখিনি, কিন্তু ওকে এখনও ঠিক আগের মতই দেখাচ্ছে। আমি আমার শবাধারের ছটা দিকই ভাল করে লক্ষ্য করলাম: ওগুলো সত্যিই খুব রুক্ষ ও অমসৃণ, করাত-কাটা ধারগুলো এখনও খুব খরখরে।

"কিছু মনে করার নেই, তাতে কোন ক্ষতি নেই," নীল কাপড়ে মোড়া একটা বাণ্ডিল খুলে সে বলে। "এটা কুং-ইয়াংয়ের বিবৃতির* মিং বংশ সংস্করণ—আপনাকে দিচ্ছি। এটা চিয়া চিংয়ের সময়কালের ** কালো মার্জিন দেওয়া। নিন। আর এটা……"

"তুমি!" আমি বিস্ময়ভরে তার চোখের দিকে তাকাই। জিজ্ঞেস করি "তুমি পাগল হয়েছ? দেখছ না আমি কি অবস্থায় ভেতরে আছি? মিং বংশ সংস্করণগুলো নিয়ে আমি কি করব?"

"তাতে কিছু ক্ষতি নেই। কিছু ভাববেন না।"

আমি তৎক্ষণাৎ বিরক্তিতে চোখ বন্ধ করি। কিছু সময় ওখানে কোন শব্দ হয় না, কোনো সন্দেহ নেই ও চলে গেছে। কিন্তু তখন মনে হ'ল আরেকটা পিঁপড়ে আমার ঘাড় বেয়ে উঠছে, এবং অবশেষে আমার মুখে পৌঁছে চোখের চারিদিকে ঘুরছে।

---

* বসন্ত ও শরৎকালের বর্ষপঞ্জীর উপরে বিবৃতি।

** ১৫২২-৬২।

আমি কখনও ভাবিনি মানুষ মরার পরেও নিজের ধারণা পাণ্টাতে পারে। হঠাৎ একটা শক্তি আমার হৃদয়ের শান্তিকে বিধ্বস্ত ক'রে দিলে। আর আমার চোখের সামনে অনেক স্বপ্ন ভেসে উঠলে। কিছু বন্ধু আমার সুখ কামনা ক'রেছিল, কিছু শত্রু আমার বিনাশ কামনা করেছিল! অথচ আমি সুখীও হইনি, বিনষ্টও হইনি বরং কোন পক্ষের আশাকেই পূরণ না করে, কোন মতে নির্জীবভাবে বেঁচে আছি। এবং এখন আমি আমার শত্রুরও অজ্ঞাতসারে, নিঃশব্দে ছায়ার মতো মরে গেছি। তাদের যে সামান্য আনন্দ দিতে আমার কিছুই খরচ হ'ত না তাও দিতে আমি ইচ্ছুক নই……।

আমার উল্লাসে আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাইলাম। মৃত্যুর পর এই হবে আমার প্রথম অশ্রুপাত।

তবুও শেষ পর্যন্ত কোন চোখের জল এল না। আমার চোখে একটা আলো ঝলসে উঠল যেন, এবং আমি উঠে বসলাম।

জুলাই ১২, ১৯২৫

এমন এক যোদ্ধা

এমন এক যোদ্ধা হবে!

যে আর বারুদভরা সুমসৃণ বন্দুক কাঁধে আফ্রিকার অধিবাসীর মতো অজ্ঞ নয়, অথবা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলধারী চীনা সবুজ-পতাকার বাহিনীর মতো* তালিকা-বিহীন নয়। সে ষাঁড়ের চামড়া বা ভাঙা লোহার তৈরী বর্মের উপর নির্ভর করে না। নিজেকে ছাড়া তার আর কিছুই নেই, আর বর্বর মানুষদের ব্যবহৃত বর্শাই একমাত্র অস্ত্র।

সে শূন্যতার পথ ধরে হেঁটে চলে, সেখানে যারাই তাকে দেখে, তারা সবাই

* চিং বংশের হান বাহিনীর সময়কালে যারা গরীব যোদ্ধা ছিল, তাদের সবুজ পতাকা দিয়ে পৃথক করে দেখান হ'ত।

একইভাবে তার কাছে মাথা নোয়ায়। সে জানে এই মাথা নোয়ানই একটা অস্ত্র যা ব্যবহার ক'রে শত্রুরা বিনা রক্তপাতে হত্যা করে, যা দিয়ে বহু যোদ্ধার প্রাণ হরণ করা হয়। কামানের গোলার মত, এ সাহসী ব্যক্তির শক্তিকে পঙ্গু করে।

তাদের মাথার উপর ঝোলে সর্ব প্রকার উপাধি খচিত হরেক প্রকার পতাকা ও নিশান: লোকহিতৈষী, পণ্ডিত, লেখক, প্রবীন যুবক, চারুকলা-অনুরাগী, ভদ্র সম্প্রদায়……। নীচে থাকে সর্বপ্রকার সুন্দর নাম খচিত নানা রকমের বিশিষ্ট কোট: বৃত্তি, বিবেকবোধ, জাতীয় সংস্কৃতি, জনমত তর্কশাস্ত্র, ন্যায়বিচার, প্রাচ্য সভ্যতা……।

কিন্তু সে তার বর্শা উদ্যত করে।

তারা একসাথে তাদের এই ভাবগম্ভীর প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাদের বুকের কেন্দ্রেই তাদের হৃদপিণ্ড আছে—অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের তা নেই। তারা কোটের বুকের ভাঁজ দিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে তাদের হৃদপিণ্ড তাদের বুকের কেন্দ্রেই আছে।

কিন্তু সে তার বর্শা উদ্যত করে।

সে হাসে ও তার বর্শা এক পাশে নিক্ষেপ করে, এবং তা তাদের বক্ষ ভেদ ক'রে যায়।

সকলে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, কেবল একটা বিশেষ কোট পড়ে থাকে যার ভেতরে কিছুই নেই। শূন্যতা পালিয়ে গেছে ও বিজয় অর্জন ক'রেছে, কারণ সে এখন এমন একজন অপরাধীতে পরিণত হ'য়েছে, যে লোকহিতৈষী ব্যক্তি ও বাকী সকলকে হত্যা ক'রেছে।

কিন্তু সে তার বর্শা উদ্যত করে।

সে বিরাট বিরাট পদক্ষেপে শূন্যতার সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে যায়, এবং আবার সেই একই ভাবে মাথা নোয়ানো, একই নিশান ও বিশেষ কোট……দেখে।

কিন্তু সে তার বর্শা উদ্যত করে।

অবশেষে সে বৃদ্ধ হয় এবং বার্ধক্যের ফলে শূন্যতার সারির মাঝেই তার মৃত্যু ঘটে। মোট কথা সে যোদ্ধা নয়, এবং শূন্যতাই বিজয়ী।

এ রকম একটা স্থানে কোন যুদ্ধের ক্রন্দন শোনা যায় না, কিন্তু শান্তি বিরাজ করে।

শান্তি……

কিন্তু সে তার বর্শা উদ্যত করে!

ডিসেম্বর ১৪, ১৯২৫

জ্ঞানীব্যক্তি, বোকা ও ক্রীতদাস

একটা ক্রীতদাস কেবল সেই লোকই খুঁজত যার কাছে সে তার দুঃখের কথা ঢেলে দিতে পারে। শুধু এইটুকুই যা সে ক'রতে পারে ও করে। একদিন সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির দেখা পায়।

"স্যার!" সে করুণভাবে কাঁদে, গাল বেয়ে তার চোখের জলের ধারা নামে।

"আপনি জানেন, আমি কুকুরের মতো জীবন যাপন করি। আমি সারা দিনে একটা বেলার খাবারও পাই না, আর পেলেও, যা পাই তা— শুধু জোয়ারের খুঁদ কুড়ো, যা শূয়োরেরাও খায় না। কেবল মাত্র ছোট এক বাটিই যে পাই সেটা না হয় নাই বললাম……।

"এটা সত্যিই খুব খারাপ," জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

"তাই নয় কি?" তার প্রাণ জেগে ওঠে। "অথচ আমি সারা দিন রাত কাজ করি। সকালে জল তুলি, সন্ধ্যেয় রাতের খাবার তৈরী করি; সকালে টুকিটাকি কাজের জন্য বাইরে যাই, সন্ধ্যায় গম পিষি; গম মিহি হ'য়ে গেলে কাপড় কাচি, কাপড় ভেজানো হ'য়ে গেলে আমি ছাতা ধরি; শীত কালে চুল্লী ধরাই, গরম কালে পাখা দোলাই। মধ্যরাতে পর্যন্ত ব্যাঙের ছাতা সেদ্ধ করি, এবং প্রভু জুয়ার আড্ডা থেকে ফিরে আসবেন বলে অপেক্ষা করি; অথচ কখনও বকশিস পাই না, কেবল মাঝে মাঝে চাবুক…।"

"ওহ্……।" জ্ঞানী ব্যক্তিটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, এবং তাঁর চোখের প্রান্ত ঈষৎ লাল দেখায়, মনে হয় যেন তিনি কেঁদে ফেলবেন।

"স্যার, এইভাবে আমি আর পারছি না। আমায় কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আমি কি করতে পারি?"

"আমি নিশ্চিত যে অবস্থার উন্নতি হবে……।"

"আপনি কি তাই মনে করেন? আমিও নিশ্চিতভাবে তাই আশা করি। আর এখন যেহেতু আমি আপনাকে আমার কষ্টের কথা বললাম এবং আপনি এত সহানুভূতি ও উৎসাহ দিলেন, তাতেই আমার বেশ ভাল লাগছে। পৃথিবীতে যে এখনও কিছু ন্যায় বিচার আছে, এটা তারই প্রমাণ।"

কয়েকদিন পরে, অবশ্য, সে আবার বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ে এবং অপর আর একজনকে খুঁজে বার করে যার কাছে সে তার দুঃখের কথা ঢেলে দিতে পারে।

"স্যার!" সে আর্তস্বরে চোখের জল ফেলে বলে, "আপনি জানেন, যেখানে আমি থাকি সেটা শূয়োরের খোঁয়াড়ের চেয়েও খারাপ। আমার প্রভু আমার সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করেন না; সে এর চেয়ে কুকুরের সাথেও দশ হাজার গুণ বেশী ভাল ব্যবহার……।"

"ওকে পরাস্ত কর!" অপর জন এমন জোরে চিৎকার করে এই শপথ নিল যে তা ক্রীতদাসটিকে ঘাবড়ে দিল। এই অপর জনটি একজন বোকা।

"স্যার, যেখানে আমি থাকি সেটা একটা ভাঙাচোরা, এক কামরার কুঁড়ে ঘর, ভাপসা, ঠাণ্ডা ও ছারপোকায় ভর্তি। যখন আমি ঘুমোবার জন্য শুই ওরা আমার রক্তে ভূড়িভোজন করে। ঘরটা দুর্গন্ধময়, এবং একটাও জানলা নেই……।"

"একটা জানলা ক'রে দেবার কথা কি তোমার প্রভুকে বলতে পার না?"

"আমি কি ভাবে তা ব'লতে পারি?"

"ঠিক আছে, আমাকে দেখাও জায়গাটা কেমন।"

বোকা লোকটা ক্রীতদাসের পেছন পেছন কুঁড়ে ঘরে যায় এবং মাটির দেয়ালে ঘা মারতে আরম্ভ করে।

"স্যার, আপনি কি করছেন?" ক্রীতদাসটি আতংকিত হয়।

"আমি তোমার জন্য একটা জানলা ক'রে দিচ্ছি।"

"তা হয় না! প্রভু আমাকে শেষ ক'রে ফেলবেন।"

"ক'রতে দাও!" বোকা লোকটা ঘা মারতে থাকে।

"বাঁচাও! একটা দস্যু বাড়ি ভেঙে ফেলছে! তাড়াতাড়ি এস, নয়ত

ও দেয়াল ভেঙে ফেলবে……।" "চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ক্রীতদাসটা উন্মাদের মতো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। একদল ক্রীতদাস বেড়িয়ে আসে এবং বোকা লোকটিকে তাড়িয়ে দেয়। সোরগোলে জেগে, ওঠে সবশেষে যে ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে বাইরে বেড়িয়ে আসেন, তিনি প্রভু।

"একটা দস্যু আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করছিল। আমিই প্রথমে হুঁসিয়ারী দিই এবং আমরা সকলে মিলে তাকে তাড়িয়ে দিই।" দাসটা শ্রদ্ধা ভরে ও বিজয়গর্বে কথাগুলো বলে।

"বেশ ক'রেছিস্!" মালিক তার প্রশংসা করে।

অনেক লোক এসে সেদিন উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে যায়, তার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিটিও ছিলেন।

"স্যার, যেহেতু আমি নিজেকে উপযোগী করে তুলেছে, তাই প্রভু আমার প্রশংসা করেছেন। আপনি যে সেদিন আমাকে বলেছিলেন অবস্থার উন্নতি হবে, সেটা আসছে আপনার দূরদৃষ্টিরই প্রমাণ।" সে অত্যন্ত আশাভরে ও খুশীর সাথে কথাগুলো বলে।

"ঠিক কথা……", জ্ঞানী ব্যক্তিটি উত্তর দেন, এবং তাঁর নিজের জন্য আনন্দিত বোধ করলেন বলে মনে হয়।

ডিসেম্বর ২৬, ১৯২৫

ক্ষয়ে যাওয়া পাতা

বাতির আলোয় সাতুলার* কবিতা পড়তে পড়তে আমি একটা শুকনো, চাপা পড়ে থাকা ম্যাপল গাছের পাতা দেখতে পেলাম।

এই পাতাটা আমাকে গত বছরের শরতের শেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল সে রাতটা এবং অধিকাংশ গাছের পাতাই

---

* সাতুলা [১২৭২-?], য়ুয়ান বংশের রাজত্বকালের একজন মঙ্গোলীয় কবি।

ঝড়ে গিয়েছিল, কেবল আমার উঠোনে একটা ছোট্ট ম্যাপল গাছ রক্তলাল হ'য়ে উঠেছিল। পাতাগুলোকে ভালভাবে দেখবার জন্য আমি গাছটার চারিদিকে ঘুরলাম। পাতাগুলো যখন সবুজ ছিল তখনও আমি সেগুলোকে এত নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করিনি। সবগুলো পাতাই লাল হ'য়ে যায় নি; বস্তুত অধিকাংশরই রং ছিল বিবর্ণ মতো আর কয়েকটার গায়ে তখনও রক্তলাল রংয়ের উপর ঘন সবুজ ছোপ ছিল। একটা পাতায় কোন পোকা একটা ছিদ্র ক'রেছিল। ছিদ্রটা, চারিদিকে কালো কাজলের ছটা নিয়ে, লাল, হলুদ, ও সবুজের বর্ণমেলা থেকে কোন উজ্জ্বল চোখের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"পাতাটা ক্ষয়রোগাক্রান্ত!' আমি ভাবলাম।

তাই ওটাকে ছিঁড়ে এনে আমি একটা সদ্য কেনা বইয়ের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। এই রোগাক্রান্ত বর্ণ বৈচিত্র্যটিকে অচিরেই খসে পড়বে, তাই বোধহয় আমি এটাকে কিছু সময়ের জন্য রেখে দিতে চেয়েছিলাম; অন্য পাতাদের সাথে এর উড়ে চলে যাওয়া রোধ ক'রতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আজ রাতে আমার চোখে এটাকে হলুদ ও মোম মাখানো মনে হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এর চোখ কম উজ্জ্বল। আরও কয়েক বছরের মধ্যে যখন এর আগের রংগুলো আমার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে, তখন হয়ত ভুলেই যাবো কেন আমি এটাকে বইয়ের ভেতর রেখেছিলাম। আমার মনে হয়, যে ক্ষয়রোগাক্রান্ত পাতাগুলো অচিরেই ঝড়ে পড়বে, তাদের যদি আমি সযত্নে রাখি তাহ'লে তাদের চিত্রবিচিত্র রংগুলোও শুধু খুবই সামান্য সময়ের জন্যই থাকতে পারে—আর ঐ সরসতা বা সবুজতার কথা না হয় নাই বললাম। আমার জানলা দিয়ে দেখি যে, যে সব গাছ ঠাণ্ডায় সবচেয়ে ভালোভাবে টিঁকে থাকতে পারে, এর মধ্যেই তাদের সব পাতাও ঝরে গেছে—ম্যাপল গাছের ঝরেছে আরও অনেক বেশী। গত বছরের মতো এবারেও শরতের শেষে অনেক রোগাক্রান্ত পাতা থাকতে পারে; কিন্তু, দুঃখের কথা, এ বছর আমার শরতের রংকে উপভোগ করার কোন সময় নেই।

ডিসেম্বর ২৬, ১৯২৫

পাণ্ডুর রক্তচিহ্নের মাঝে

—যাঁরা মৃত, যাঁরা জীবিত, যাঁরা এখনও জন্মান নি তাঁদের কয়েকজনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।*

বর্তমানে স্বষ্টিকর্তা এখনও একজন দুর্বল ব্যক্তি।

গোপনে তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটান, কিন্তু এই পৃথিবীকে ধ্বংস কবার সাহস পান না। গোপনে তিনি জীবিত প্রাণীর মৃত্যু ঘটান, কিন্তু তাদের মৃতদেহগুলোকে সংরক্ষিত করার সাহস পান না। গোপনে তিনি মানবজাতিব রক্তপাত ঘটান, কিন্তু সেই রক্তচিহ্নকে চিরসজীব ক রে রাখার সাহস পান না। গোপনে তিনি মানবজাতিকে যন্ত্রণা দগ্ধ করেন, কিন্তু সেই যন্ত্রণাকে তাদের চিরস্মরণীয় ক'রে রাখতে দিতে সাহস পান না।

ঐশ্বয্যময় প্রাসাদগুলোকে পৃথক ক'রে রাখার জন্য, পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও নির্জন কবরগুলোকে সামনে রেখে; যন্ত্রণা ও রক্তচিহ্নগুলোকে হালকা করাব জন্য কালহরণ ক'রে; তিনি মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের সমজাতের দুর্বল ব্যক্তিদের জন্যই কেবল প্রতিদিন এক পেয়ালা সামান্য মিষ্টি মেশানো তিক্ত সুরা সরববাহ করেন, যাতে তাদের কিঞ্চিত নেশা হয়। মদের পরিমান খুব বেশী নয়, খুব কমও নয়। মানুষকে তিনি এটা দেন যাতে এই সুরা পান ক'রে তারা কাঁদতে ও গান গাইতে পারে, একই সাথে শান্ত ও প্রমত্ত, সচেতন ও অচেতন মনে হয়, বেঁচে থাকতে ও মরে যেতে অভিলাষী ব'লে বোধ হয়। তিনি অবশ্যই সমস্ত প্রাণীদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক ক'রে তুলবেন। তবু তাঁর মানবজাতিকে ধ্বংস ক'রে ফেলার সাহস নেই।

কয়েকটা পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও কিছু নির্জন কবর পৃথিবীর বুকে

---

* ১৮ই মার্চের ঘটনার পর এটা লেখা হ'য়েছিল। তখন উত্তরের যুদ্ধবাজ জুয়ান চি-থুই, জাপানী, ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের প্রতিবাদে মিছিলকারী পিকিংয়ের ছাত্র ও শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের উপর পুলিশদের গুলি চালাবার হুকুম দেন। ৪৭ জন নিহত এবং ১৫০ জন আহত হন।

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, পাণ্ডুর রক্তচিহ্নগুলোর মাঝে প্রতিফলিত; এবং সেখানে মানুষ নিজেদের ও অপরের মিথ্যে যন্ত্রণা ও দুঃখের আস্বাদ নেয়। তারা একে পদদলিত করবে না, বরং ভাববে, কিছু না থাকার চেয়ে এটা থাকাই শ্রেয়; এবং তাদের এই যন্ত্রণা ও দুঃখের আস্বাদ নেওয়াকে যুক্তিযুক্ত ক'রে তোলার জন্য তারা নিজেদেরকে "স্বর্গের বলি" বলে আখ্যা দেয়। আশংকামূলক নিরবতার মধ্যেই তারা সেই নতুন যন্ত্রণার ও দুঃখ, নতুন কষ্টের আগমনের পথ চেয়ে থাকে, যা তাদের আতংকিত করে, তবুও, যা পাবার জন্য তারা আকুল হ'য়ে পড়ে।

এরা সকলেই সৃষ্টিকর্তার অনুগত প্রজা। তারা এমনটি হোক এটাই তিনি চান।

মানব জাতির মধ্যে থেকে একজন বিদ্রোহী যোদ্ধা জেগে উঠেছেন। তিনি মাথা তুলে দাঁড়ান এবং অতীত ও বর্তমানের সমস্ত পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও নির্জন কবরের গূঢ় মর্ম উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত তীব্র ও সীমাহীন যন্ত্রণার কথা স্মরণ করেন; তিনি সর্বোতভাবে সমস্ত ছেটানো ছড়ানো জমাট বাধা রক্তের চিহ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড়ান; যারা মৃত এবং যারা জীবিত, যারা জন্মেছেন এবং যারা এখন ও জন্মায় নি, তাদের সকলকেই তিনি চিনতে পারেন, তিনি সৃষ্টিকর্তার লীলার গূঢ়তত্ত্ব বুঝতে পারেন। এবং তিনি মানবজাতিকে, সৃষ্টিকর্তার এই অনুগত প্রজাবর্গকে, হয় পুনরুজ্জীবিত না হয় ধ্বংস করবার জন্য জেগে উঠবেন।

এই দুর্বলপ্রাণ সৃষ্টিকর্তা লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন। তারপর এই যোদ্ধার চোখে বদলে যায় স্বর্গ ও পৃথিবীর রঙ।

এপ্রিল ৮, ১৯২৬

জাগরণ

স্কুলে যাওয়া ছাত্রদের মত, বোমা ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি সকালে প্লেনগুলো পিকিংয়ের আকাশে উড়ে বেড়ায়।* এবং প্রতিবার যখন আমি শুনি তাদের ইঞ্জিনগুলো বাতাসকে আক্রমণ করছে, আমি কিছুটা বিশেষ ধরণের উত্তেজনা অনুভব করি, মনে হয় যেন আমি মৃত্যুর আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছি, যদিও এই ঘটনা আমার জীবনের অস্তিত্বের চেতনার বৃদ্ধি করছে।

একটা কি দুটো চাপা বিস্ফোরণের পর, প্লেনগুলো গুঞ্জন তুলে ধীরে ধীরে দূরে উড়ে চলে যায়। হয়ত তখন কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু পৃথিবীকে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও বেশী শান্ত মনে হয়। জানলার বাইরের পপলার গাছের কচি পাতাগুলো সূর্য্যের আলোয় উজ্জ্বল সোনালী দীপ্তি ছড়ায়; পুষ্পিত কুল গাছের ফুলেরা গতকালের চেয়েও বেশী গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। যখন আমি বিছানার সর্বত্র ছড়ানো খবরের কাগজ সরিয়ে ফেলি এবং ডেস্কের উপর গতরাত্রে জমে থাকা হালকা ধূসর ধুলো মুছে ফেলি, আমার সামান্য, সত্যিকারের পড়াশুনো এই বর্ণনা অবধি এগিয়ে যায় যে, "উজ্জ্বল জানলা ও নিষ্কলঙ্ক ডেস্ক।"

কোন না কোন কারণে, আমি এখানে জমে থাকা নতুন সব লেখকদের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ক'রতে আরম্ভ করি। আমি তাদের সবগুলো লেখা পড়তে চাই। আমি কালক্রম অনুসারে সেগুলো পড়ি, এবং এই সব নতুন লেখকদের আত্মা, যারা কোন রকম আবরণ রাখতে ঘৃণা বোধ করে—তারা আমার সামনে একে একে জেগে ওঠে। ওরা চমৎকার, ওদের সম্পূর্ণতা আছে—কিন্তু, হায়! কি ভীষণ অসুখী ওরা! ওরা গভীর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, ক্রুদ্ধ হয়, এবং সবশেষে রূঢ় হ'য়ে পড়ে,—আমার প্রিয় যুব সম্প্রদায়।

ধুলো ও বাতাসের আক্রমণে তাদের আত্মা আরও রূঢ় হ'য়ে ওঠে, কারণ তাদের আত্মা মানুষেরই আত্মা, যাকে আমি ভালবাসি। আমি এই রক্ত-

---

* ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে যখন জেনারেল ফেং ইও-শিয়াং, উত্তরের যুদ্ধবাজ চ্যাং সো-লিন'ও লি চিং-লিনের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন তখন যুদ্ধবাজদের প্লেন বহুবার পিকিংয়ে বোমা ফেলতে এসেছিল।

ক্ষরা কিন্তু আকারহীন, বর্ণহীন রূঢ়তাকে সানন্দে চুম্বন করব।। এই সুরুচিপূর্ণ দুর্লভ ফুলে ফুলে ভরা বহু-খ্যাত বাগানগুলোতে বিনয়ীও গোলাপী মেয়েরা অলসভাবে সময় অতিবাহিত করছে. যেমন সারস পাখী ডাকে এবং ঘন সাদা মেঘের দল উপরে উঠে যায়……। এই সমস্ত কিছুই আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে, কিন্তু আমি ভুলতে পারি না যে আমি মানুষের পৃথিবীতেই বাস করছি।

এবং এটা হঠাৎ আমাকে একটা ঘটনা মনে করিয়ে দেয়: দুই বা তিন বছর আগে, আমি একদিন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঘরে বসেছিলাম। তখন একটি ছাত্র ভেতরে এল। আমি তাকে চিনি না। সে আমার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিল এবং তারপর একটাও কথা না বলে চলে গেল; এবং আমি সেটা খুলে দেখলাম তার ভেতরে 'ছোট ঘাস'* পত্রিকার একটা কপি।

সে একটাও কথা বলেনি, অথচ, কি আশ্চর্য রকম সবাক নিরবতা, এবং সেটা কি সমৃদ্ধ উপহার! আমি দুঃখ বোধ করলাম যে 'ছোট ঘাস' আর প্রকাশিত হচ্ছে না; এটা কিন্তু 'নিমজ্জিত ঘণ্টার'** অগ্রদূতের কাজ ক'রেছে বলে মনে হয়। এবং 'নিমজ্জিত ঘণ্টা' বাতাসের গুহা কন্দরে ও মানব সাগরের তলের ধুলায় একাকীই ধ্বনিত হচ্ছে।

যদিও এই বুনো কাঁটাগাছটিকে মূলতঃ পিষে মৃত প্রায় ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সে এখনও একটা ছোট ফুল ধারণ করবে। আমার মনে পরে টলস্টয় কিভাবে না এর দ্বারা অভিভূত হ'য়েছিলেন, কি ভাবে এ তাঁকে একটা গল্প লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। অবশ্য, যখন কোন ধূসর মরুভূমিতে গাছেরা মাটির গভীর তল থেকে জল শুষে নেবার জন্য বেপরোয়াভাবে শিকড় প্রসারিত ক'রে পান্না-সবুজ বনানী সৃষ্টি করে, তারা নিজেদেরই বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে। তবুও সেই দৃশ্যে ক্লান্ত, রৌদ্রদগ্ধ পথিকের হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে, কারণ তারা জানে যে তারা একটা সাময়িক বিশ্রামস্থলে এসে পৌঁছেছে। বস্তুত এটা গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিমর্ষতা জাগ্রত করে।

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে, "নামহীন" এই শিরোনামে 'নিমজ্জিত ঘণ্টার' সম্পাদকেরা লিখলেন, "কিছুলোক বলেন আমাদের সমাজ একটা মরুভূমি।

---

* ১৯২৪ সালে নতুন লেখকদের দ্বারা প্রকাশিত একটা সাহিত্য ত্রৈমাসিক।

** ১৯২৫ সালে প্রকাশিত সাহিত্য সাপ্তাহিক।

যদি ব্যাপারটা সত্যিই তাই হ'ত, নিরানন্দ করলেও বরং এটা আপনাকে একটা শান্তির অনুভূতি এনে দিত, নির্জন হ'লেও বরং এটা আপনাকে একটা অসীমত্বের অনুভূতি প্রদান করত। এটা কখনই এখনকার মতো এত বিশৃংখল, বিমর্ষ, এবং সর্বোপরি এত পরিবর্তনশীল হ'ত না।"

হ্যাঁ, যুবকদের আত্মা আমার সামনে জেগে উঠে উঠেছে। তারা রূঢ় হয়েছে বা হ'তে যাচ্ছে। কিন্তু আমি এইসব আত্মাগুলোকে ভালবাসি যারা নীরবে রক্ত ঝরায় ও যন্ত্রণা ভোগ করে, কারণ তারাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমি মানুষের পৃথিবীতে বাস করছি—আমি মানুষের মাঝে বাস করছি।

আমার সম্পাদনা করার মাঝেই সূর্য অস্ত গেল, এবং আমি বাতির আলোয় কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। সমস্ত ধরণের যৌবন আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠছে, যদিও আমার চারিদিকে গোধূলির ঈষৎ আঁধার ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি ক্লান্ত, একটা সিগারেট ধরাই। অনির্দ্দিষ্ট চিন্তায় ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করি এবং একটা দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, স্বপ্ন দেখি আমি চমকে জেগে উঠি। চারিদিকে আমার-তখনও শুধুই গোধূলির ঈষৎ আঁধার। গ্রীষ্মের আকাশে ছোট ছোট মেঘের টুকরোর মত, স্তব্ধ বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া ধীরে ধীরে বর্ণনাতীত আকারে রূপান্তরিত হবার জন্য উপরে উঠতে থাকে।

এপ্রিল ১০, ১৯২৬